সম্পাদকীয়

মহররম মাস : গভীর মমতায় দরূদ শরীফ পাঠে মনোনিবেশ করুন

এই হিজরী মাসটি মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য অত্যন্ত বেদনা বিধুর এক মাস। এ মাসে শাহাদত বরণ করেছেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর দৌহিত্র হযরত ইমাম হুসায়েন (রা.)।

সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রামে তাঁর এই আত্মত্যাগ সর্বকালের জন্য অনুকরণীয় এক দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) বলেন–

"মহররম মাস শুরু হয়ে গিয়েছে। এই মাস আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর বংশধরগণের প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিত। পবিত্র দরূদ শরীফ পাঠ সাধারণ ভাবে দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করে নেয়া উচিত।

তদুপরি মহররম মাসের হৃদয়বিদারক দিনগুলোর কথা স্মরণ করে একান্ত নিবিষ্ট চিত্তে দরূদ পাঠের প্রতি বিশেষ জোর দিয়ে মর্মবেদনায় জর্জরিত অবস্থা অন্তরে সৃষ্টি হয়ে যাওয়া জরুরী। অতএব এই দু:খজনক ঘটনার কথা কখনো বিস্মৃত হবেন না। সফরেই থাকুন আর বিশ্রামেই থাকুন যখনই সুযোগ পাবেন, যখনই আপনার অন্তর অন্য কোন বিষয় থেকে মুক্ত হবে তখনই হৃদয়-অন্তরের মমতা ঢেলে দিয়ে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার আশিস ও কল্যাণ কামনা করে দরূদ প্রেরণ করতে থাকুন।"

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বংশধরগণের প্রতি পরম মমতায় প্রদর্শিত অভিব্যক্তিগুলো যেন ঔদ্ধত্যপূর্ণ অশালীন অসহিষ্ণু অমানবিক ও ক্রুর-হিংস্রতাপূর্ণ না দেখায়। সে জন্য প্রত্যেকের সজাগ ও সক্রিয় ভূমিকা রাখা উচিত। এক্ষেত্রে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের পংক্তি স্মর্তব্য–

'ত্যাগ চাই
মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না'

৩১ ডিসেম্বর ২০০৯

সূচীপত্র	*পৃষ্ঠা নং*
● কুরআন শরীফ	২
● হাদীস শরীফ	৩
● অমৃত বাণী	৪
● *জুমুআর খুতবা ঃ* *হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)*	৫-১২
● বয়আতের শর্তসমূহ এবং একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য *হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)*	১৩-১৮
● ইসলাম প্রচার প্রসার ও বিস্তারে আহমদীয়াত	১৯-২১
● হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকসমূহ পাঠের গুরুত্ব ও উপকারিতা সংকলন ও অনুবাদ : মওলানা জাফর আহমদ	২২-২৩
● মসজিদগুলো বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হবে মাহমুদ আহমদ সুমন	২৪
● হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)-এর বাংলাদেশ সফর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল	২৫-২৬
● খিলাফত হারা মুসলমানদের অমানবিক কর্মকান্ড সংগ্রহ : ডা: শেখ হেলাল উদ্দিন আহমদ	২৭-২৮
● নবীনদের পাতা	২৯-৩৫
● সংবাদ	৩৬

প্রচ্ছদ ডিজাইন : তারেক আহমদ সবুজ

মহান বিজয় দিবস অমর হোক

এবারের মহররম মাস এবং বিজয়ের মাস একই সাথে মিলে যাওয়ার কারণে আমরা মুসলিম উম্মাহ্‌র সাথে একাত্ম হয়ে যেমন ব্যথিত ও মর্মাহত তেমনি সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আমাদের এই প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হওয়ার কারণে আনন্দাপ্লুতও বটে। তাই মহান এই বিজয়ের মাসে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি রইলো আমাদের আন্তরিক মুবারকবাদ ও প্রাণঢালা শুভেচ্ছা সেই সাথে মহান করুণাময়ের সমীপে বিনীত যাচনা এই যে, যে আত্মত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে আমরা এই স্বদেশকে শত্রুমুক্ত করেছি তেমনি ইসলামের সুন্দর ও শাশ্বত শিক্ষায় আমরা আমাদের অন্তরাত্মাকে সকল অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করে আহমদীয়া খিলাফতের অনুপম সৌন্দর্যে বিশ্বকে উদ্ভাসিত করবো, ইনশাআল্লাহ্।

কুরআন শরীফ
সূরা হূদ-১১

৭৮। আর আমাদের প্রেরিতরা যখন লূতের কাছে এলো, সে তাদের দরুন চিন্তিত হলো এবং তাদের ব্যাপারে অসহায় বোধ করলো[১৩৩৫]। আর সে বললো, 'এ যে এক বড়ই কঠিন দিন।'

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ
ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۝٧٨

৭৯। আর তার জাতি তার দিকে ছুটে[১৩৩৬] এলো। এর পূর্বেও তারা মন্দ কাজ করতো। সে বললো, 'হে আমার জাতি! এরা হলো আমার কন্যা। এরা তোমাদের কাছে অত্যন্ত সতীসাধ্বী[১৩৩৭]। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আর আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে লাঞ্ছিত করো না। তোমাদের মাঝে কি একজনও সুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি নেই?'

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا
يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ
أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ
مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ۝٧٩

১৩৩৫। "যা-কা বিল আমরে যারআন" অর্থ সে অক্ষম, ক্ষমতাহীন বা কোন কিছু করতে অপারগ। "যারউন" অর্থ শক্তি সামর্থ্য অথবা এটা দ্বারা বস্তু বা বিষয় তার কাছে কঠিন বা কষ্টকর হল (লেইন) তফসীরাধীন শব্দাবলীর অর্থ হল এই বিষয়ে তিনি [লূত (আ.)] নিজেকে অসামর্থ্য কষ্টদায়ক অবস্থায় পতিত মনে করলেন; অপরিচিতদেরকে আশ্রয় দেয়ার জন্য নিজেকে অসহায় বোধ করলেন।

১৩৩৬। সদোম ও ঘমোরাহ দুই শহরের অধিবাসীরা অপরিচিত পথচারী দেখলে দৌঁড়িয়ে এসে লুটতরাজ করত (যিউ এনসাইকো, সদোম অধ্যায়)। স্বভাবতই তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে বলে, সর্বদা শঙ্কিত থাকত, বিশেষত: শহরের লোকেরা যারা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে সর্বক্ষণ যুদ্ধংদেহী অবস্থায় থাকত (আদি-২৪) তারা নিজেদের শহরে কোন অচেনা লোকের আগমন পসন্দ করত না। আল্লাহ্‌ তাআলার সকল নবীগণের মতই হযরত লূত (আ.)ও স্বাভাবিক কারণেই অতিথির আরামের প্রতি খেয়াল করতেন এবং তাদের জন্য আতিথেয়তা প্রদর্শন করতেন (১৫:৭১)। তাঁর জাতির লোকেরা লূত (আ.)কে বারংবার অতিথি সেবার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। সুতরাং যখনই তিনি "প্রেরিতগণকে' তার বাড়ীতে স্বাগত জানালেন তখনই তাঁর শহরবাসী ক্রুদ্ধ লোকেরা উত্তেজিত হয়ে ছুটে আসল এবং ভাবল যে তাদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে অপরিচিত লোককে আশ্রয় দেয়ার অভিযোগে লূত (আ.)কে শাস্তি দেয়ার এটাই সুবর্ণ সুযোগ (১৫:৬৮-৭১)।

১৩৩৭। এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত লূত (আ.) তাঁর জাতির লোকদের অতীতের মন্দ আচরণের কথা মনে করে এই ভেবে ভীত হয়েছিলেন যে, এইসব

(অবশিষ্টাংশ ১৮ এর পাতায় দেখুন)

হাদীস শরীফ

অহংকারীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না

কুরআন :

এবং ভূ-পৃষ্ঠে অহংকারের সাথে চলাফেরা করো না, কোন দাম্ভিক অহংকারীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। (লোকমান : ১৯)

হাদীস :

কেউ যেন অন্যের কর্তৃত্বাধীন স্থানে গিয়ে ইমামতী না করে এবং কারো বাসায় গিয়ে (গৃহ মালিকের) বসার স্থানে অনুমতি ব্যতিরেকে না বসে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা :

ইসলাম জীবনের উন্নততর বিকাশ চায়। এমন একটি সমাজ গড়ে তুলতে চায় যেখানে মানবতার বিকাশের সাথে সাথে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির উত্তম সম্পর্ক গড়ে উঠবে। উন্নতির পথে সহায়ক এমন প্রতিটি বিষয়-বস্তুকে ইসলাম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেছে। মানবতার বিকাশের জন্য বিনয়ী হওয়া আবশ্যকীয়।

বিনয়ই মানুষের জন্য মানুষের মাঝে প্রেম, ভালোবাসা ও সহানুভূতির জন্ম দেয়। তাই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, তোমার চলাফেরার মাঝে যেন অহংকারের ছাপ না থাকে। কেননা আল্লাহ্ অহংকারকে পসন্দ করেন না। সাধারণত যে অহংকারী সে কখনও বলে না যে, আমি অহংকারী বা নিজে অহংকারী তা-ও স্বীকার করে না। অহংকারীর পরিচয় তার আমলে। শুধু যে জাগতিক বিষয়েই মানুষ অহংকারী হয় তা নয় বরং আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও মানুষ অহংকারী হয় যা অত্যন্ত ভয়াবহ। অহংকার মানুষকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিপতিত করে। হযরত নবী করীম (সা.) তাঁর মহামূল্যবান বাণীতে অহংকারের দু'টি চিহ্ন বর্ণনা করেছেন, প্রথমত একজন যত বড়ই আলেম হোক না কেন তিনি যেন কোথাও গমন করে স্থানীয় ইমামের অনুমতি ব্যতিরেকে ইমামতী না করেন। হ্যাঁ এমন ব্যক্তি, যে খিলাফতের ব্যবস্থাপনায় সর্বস্থানে ইমাম হবার যোগ্যতা রাখে তার ব্যাপার ভিন্ন। নবী করীম (সা.) আরেকটি চিহ্ন বর্ণনা করেছেন যে, কারও বাসায় গেলে গৃহকর্তার আসনে যেন তার অনুমতি ব্যতিরেকে কেউ না বসে। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে ব্যাপারটি অতি গুরুতর। এরূপ স্থানেই মানুষের ব্যক্তিত্ববোধ জাগ্রত হয়। আর সেটাই হলো মানুষের জন্য বিনয় প্রকাশের উত্তম স্থান। আল্লাহ্ করুন আমরা যেন বিনয়ের পথ অনুসরণের মাধ্যমে খোদার নৈকট্য লাভ করি। আমীন।

> ***মানবতার বিকাশের জন্য বিনয়ী হওয়া আবশ্যকীয়। বিনয়ই মানুষের জন্য মানুষের মাঝে প্রেম, ভালোবাসা ও সহানুভূতির জন্ম দেয়।***

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা :
আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী
হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

হে মুসলমানেরা! শুন এবং মন দিয়ে শুন। ইসলামের পবিত্র প্রভাবকে বাধা দেয়ার জন্য খৃষ্টান জাতি ব্যাপক কুটিল কুৎসা রটনা করছে এবং প্রবঞ্চনামূলক উপায় অবলম্বন করছে। আর এসব প্রচারের জন্য প্রাণান্তকর পরিশ্রমের সাথে ধন-সম্পদ পানির ন্যায় বইয়ে দিচ্ছে। এমনকি এ উদ্দেশ্যে অতি লজ্জাজনক উপায় অবলম্বন করা হয়েছে। এ নিয়ে ঘাঁটা-ঘাঁটি না করে এ প্রবন্ধকে পবিত্র রাখাই উত্তম। খৃষ্টান জাতি ও ত্রিত্ববাদের সমর্থনকারীদের পক্ষ থেকে এগুলো এরূপ যাদুকরী কার্যকলাপ যে, তাদের এ যাদুর বিরুদ্ধে খোদাতাআলা যে পর্যন্ত তাঁর সেই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পরাক্রমশালী হাত না দেখাবেন এবং অলৌকিক শক্তি দ্বারা এ যাদুর ধাঁধাঁ ছিন্ন ভিন্ন করে না দেবেন, সেই পর্যন্ত ফিরিঙ্গী জাতির এ যাদু থেকে সরলমনা জনগণের মুক্তি লাভ সম্পূর্ণরূপে অকল্পনীয়।

অতএব খোদা তাআলা এ যাদু নস্যাৎ করার জন্য এ যুগের খাঁটি মুসলমানদেরকে এক মোজেযা (অলৌকিক নিদর্শন) দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর এ দাসকে নিজ ইলহাম, বাণী ও বিশেষ আশিস এবং কল্যাণ দ্বারা সম্মানিত করেছেন।

আর তিনি এ দাসকে তাঁর পথের সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান দান করে বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় পাঠিয়েছেন। এ ছাড়া তিনি এ দাসকে বহু স্বর্গীয় উপহার, অলৌকিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান দান করেছেন, যাতে এ স্বর্গীয় পাথরের সাহায্যে যাদু দিয়ে তৈরী ফিরিঙ্গীদের সেই মোমের মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা যায়।

সুতরাং হে মুসলমানরা! সেই যাদুর অন্ধকার দূর করার জন্য এ অধমের আবির্ভাব খোদাতাআলার পক্ষ থেকে এক মোজেযা (অলৌকিক নিদর্শন)। যাদুর বিরুদ্ধে পৃথিবীতে কি অলৌকিক নিদর্শনও প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক ছিল না? যাদুর পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া এরূপ জঘন্য স্তরের প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে খোদাতাআলার পক্ষে এরূপ এক জ্যোতি: দেখানো, যা অলৌকিক শক্তির প্রভাব রাখে, তোমাদের দৃষ্টিতে কি বিস্ময়কর ও অসম্ভব বোধ হয়?

[ফতেহ ইসলাম পুস্তকের বাংলা সংস্করণ, পৃ: ৭-৮]

হে পৃথিবীর সকল অধিবাসীবৃন্দ! হে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মানবাত্মাবৃন্দ! আমি সম্পূর্ণ জোরের সঙ্গে তোমাদের সামনে এই ঘোষণা দিচ্ছি যে, এখন পৃথিবীর বুকে একমাত্র সত্য ধর্ম হচ্ছে ইসলাম, সত্য খোদাও সেই খোদা যার বর্ণনা দিয়েছে কুরআন; এবং চিরন্তন আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারী এবং গৌরব ও পবিত্রতার সিংহাসনে সমাসীন নবী হলেন **হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম,** যাঁর আধ্যাত্মিক জিন্দেগী ও পবিত্র গৌরবের এ প্রমাণ আমি পেয়েছি যে, তাঁর আনুগত্য ও ভালবাসায় আমরা রূহুল কুদুসকে পেয়ে থাকি এবং খোদার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারি এবং ঐশী নিদর্শন দেখার সৌভাগ্য লাভ করি।

(তিরইয়াকুল কুলুব, পৃ: ১১)

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ *

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (آمين)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

(সূরা বাকারা ১৫৪-১৫৮)

আমি যে আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেছি তাতে আল্লাহ্ তাআলা সেসব মুমিনদের ছবি অংকন করেছেন যারা কোন পরীক্ষা ও বিপদাপদে নিপতিত হলে তাদের ঈমানে কোন বিচলতা সৃষ্টি হয় না বরং পরীক্ষার সাথে সাথে তাদের ঈমানে দৃঢ়তা সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহ্ তাআলার সমীপে তারা পূর্বাপেক্ষা বেশি অবনত হয়। আমি এবারে এ আয়াতসমূহের অনুবাদ করে দিচ্ছি। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, হে যারা ঈমান এনেছো! ধৈর্য্য ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্য্যশীলদের সাথে রয়েছেন। আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পারছো না। অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা, ধন-সম্পদ, প্রাণ ও ফলফলাদির ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করব। ধৈর্য্যশীলদেরকে তুমি সুসংবাদ দিয়ে দাও–সে সব লোক, যাদের ওপর বিপদাবলী আপতিত হলে তারা বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্ তাআলারই এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। এরাই সে সব লোক যাদের প্রতি তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আশীষ ও রহমত বর্ষিত হয় এবং এরাই হেদায়াতপ্রাপ্ত। যেভাবে প্রথম আয়াত হতে এটা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তাআলা মু'মিনদেরকে ধৈর্য্য ও নামাযের তাগিদ করেছেন। এ দু'টি বৈশিষ্ট্য এমন যা একজন মু'মিন মুসলমানের মাঝে থাকা উচিত, বিশেষ করে বিপদ-আপদ ও পরীক্ষার সময় এর বহিঃপ্রকাশ ঘটা উচিত। বাহ্যত এটি একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য কিন্তু এর অর্থ অনেক ব্যাপক। **'সবর'** শব্দের একটি অর্থ হল, কষ্টে পতিত হলে মানুষ যেন অভিযোগ ও কান্না-কাটি না করে এবং কোন ধরণের অভিযোগ ও অনুযোগ ছাড়াই বিপদ-আপদ বা পরীক্ষা সহ্য করে, কেননা এটি আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এসে থাকে। এর কারণ, অনেক সময় উত্তেজিত অবস্থায় অভিযোগ করা এবং কোন ধরণের ক্ষতির জন্য আর্তনাদি কান্নাকাটি মুখ ফসকে এমন সব কথা বের করিয়ে দেয় যা আল্লাহ্র প্রতি অনুযোগ করা ও কুফর করার শামিল। দ্বিতীয় অর্থ হল, দৃঢ়তার পরিচয় দাও। তৃতীয় অর্থ হল, আল্লাহ্ তাআলার আদেশ নিষেধের ওপর দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত থেকে সেগুলোর ওপর আমল কর আর এর আরও একটি

নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্য্যশীলদের সাথে রয়েছেন। আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পারছো না।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)
খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস কর্তৃক
মসজিদে বায়তুল ফুতুহ লন্ডনে
২ অক্টোবর ২০০৯/ ২ ইখা ১৩৮৮
হিজরী শামসী প্রদত্ত
জুমুআর খুতবা

অর্থ হল, আল্লাহ্ তাআলা যে সব বিষয় নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে নিজেকে রক্ষা করা। অতএব ধৈর্য্যের দুটি মাধ্যম ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোর একটি হলো সইতে পারা, সাহস এবং আত্মবিশ্বাসী হয়ে সব ধরণের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ ও পরীক্ষার সময় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক, তোমাদের পদক্ষেপে যেন কোন প্রকার শিথিলতা না আসে এবং তোমাদের ঈমানে যেন কোন ধরণের দুর্বলতার সৃষ্টি না হয়। দ্বিতীয়টি হল, আল্লাহ্ তাআলার যে সব আদেশ-নিষেধ রয়েছে সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে তোমরা তোমাদের জীবন অতিবাহিত কর এবং আল্লাহ্ তাআলার সমীপে বিনত হয়ে থাকো। সব্‌র-এর সাথেই **'সালাত' (নামায)** শব্দটি ব্যবহার করে দোয়া করার প্রতি দৃষ্টি দেয়ার অধিক তাগিদ করেছেন। বিভিন্ন অভিধানে **'সালাত'** শব্দের যে অর্থ দেয়া হয়েছে এর সারসংক্ষেপ এভাবে বলা যায়, নামাযের প্রতি মনোযোগী হও, নামায ছাড়াও দোয়ার প্রতি জোর দাও, ধর্মের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক, ইস্তেগফারের প্রতি মনোযোগী হও, যিকরে ইলাহী ও আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসার প্রতি মনোযোগী হও এবং মহানবী (সা.) এর প্রতি দুরূদ প্রেরণ কর। এ আয়াতে একজন সত্যিকার মুসলমানের এ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, বিপদাপদ ও পরীক্ষার সময় সর্বদা পরিপূর্ণ ধৈর্য্য ও আত্মবিশ্বাসের সাথে দুঃখ-কষ্টের যুগ উতরে যাও, কোন অবস্থাতেই যেন তোমাদের পুণ্যকর্ম করার ক্ষেত্রে এবং উচ্চতর চারিত্রিক গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে কোন প্রকার কমতির সৃষ্টি না হয়। দুঃখ-কষ্ট ও পরীক্ষার যুগে নামায, দোয়া, যিকরে ইলাহী এবং দুরূদ শরীফ পাঠের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হও। এই চিন্তা-চেতনা ও কর্মকান্ডের সাথে যখন তোমরা আল্লাহ্ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং এর ওপর দৃঢ়তার সহিত প্রতিষ্ঠিত থাকবে ও স্থায়ীত্বের পরিচয় দিবে তখন স্মরণ রেখো এই সাময়িক পরীক্ষার যুগ সর্বদাই তোমাদেরকে সফলতা ও বিজয় এনে দেবে। আল্লাহ্ তাআলার সত্ত্বা একজন মুমিনের শেষ ভরসা স্থল। নাউ'যুবিল্লাহ্ কোন আহমদী যদি এটা বলে যে, আমি আল্লাহকে মানি না, এটা হতে পারে না। কেননা আল্লাহ্ তাআলার ওপর ঈমান দুর্বল হলে সে আহমদী আর আহমদীই থাকে না। এমনিতেই (তার মাঝ থেকে) আহমদীয়াত মুছে যায় এবং তার হৃদয় থেকে ইসলাম নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। কাজেই একজন আহমদী মুসলমানদের অদৃশ্য আল্লাহ্ তাআলার ওপর ঈমান রাখার পর এ বিষয়ের ওপরও পরিপূর্ণ বিশ্বাস থাকা উচিত যে, সর্বাবস্থায় একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সত্ত্বাই আমার ভরসা স্থল। কাজেই শত্রুদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ভাবে আমাদেরকে যে সব বিপদাপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় সে ক্ষেত্রে বিবেক-বুদ্ধি ও ঈমানের দাবী হল যিনি উত্তম আশ্রয়স্থল এবং বিপদাপদ ও পরীক্ষা হতে রক্ষাকারী আমরা যেন সেই সত্ত্বার সাথে সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে আরো বেশি অগ্রগামী হই। পরীক্ষার সময় ধৈর্য্য ও দোয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ রং-এ রঙিন হয়ে আমরা যখন আল্লাহ্ তাআলার সমীপে অবনত হই তখন তিনি আমাদেরকে সকল প্রেমিকের চেয়েও বেশি ভালবাসেন। তিনি (আল্লাহ্ তাআলা) সেই মা-এর চেয়েও নিজ বান্দাদেরকে বেশি ভালবাসেন যে মা তার বাচ্চার কষ্টে স্বীয় মমতার কাছে পরাভূত হয়ে সন্তানের কষ্ট দূর করার চেষ্টা করে থাকে। আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াতের শেষে **ইন্নাল্লাহা মায়াস্ সাবেরীন** বলে এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, তোমাদের মধ্য থেকে যারা ধৈর্য্য ধারণ করবে এবং দোয়া করবে অবশ্যই আমি তাদেরকে সাহায্য করব কিন্তু তোমরা যদি আমার সাহায্য চাও তবে দৃঢ়তার সাথে আমার বান্দা হওয়ার দায়িত্ব পালন করতে হবে। বান্দা হওয়ার দায়িত্ব সে ভাবেই পালিত হবে যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি, পরীক্ষার সময় তোমাদের দৃঢ় পদক্ষেপে যেন কখনোই শিথিলতার সৃষ্টি না হয়। একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে বিনত হও। এটি এখন প্রতিটি আহমদীর দায়িত্ব। যেভাবে আমি গত খুতবাতে কয়েকবার বলেছি, পাকিস্তান, আরবের কয়েকটি দেশ এবং ভারতের কিছু কিছু এলাকাতে আহমদীদের ওপর কিছু কঠোর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বা সৃষ্টি করা হচ্ছে। পাকিস্তানের মত অবস্থা তো কোথাও নেই, সেখানে খুবই কষ্টদায়ক অবস্থা বিরাজ করছে। পাকিস্তানের কোথাও কোথাও চরম নির্যাতন চলছে। প্রতি দিনই মৌলবীরা কোন না কোন বিশৃঙ্খলা করে চলেছে আর সরকারও তাদের সহায়তা করছে। কোন কোন স্থানে প্রশাসনের লোকেরা আহমদীয়া জামা'তের সদস্যদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করার ক্ষেত্রে কোন কমতি করে না। কোন কোন দেশের বিভিন্ন স্থানে আহমদীদের ওপর জুমুআর নামায ও ওয়াক্তি নামায পড়ার ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ডেকে বলা হয়, তোমরা নামায পড়বে না, জুমুআর নামায পড়বে না এবং তোমরা একত্রিত হবে না। যাই হোক যেভাবে আমি বলেছি, আল্লাহ্ তাআলা বলেন এ অবস্থায় (তোমরা তোমাদের) ঈমানে পূর্বাপেক্ষা অধিক দৃঢ়তা সৃষ্টি কর।

দৃঢ়তা সৃষ্টির সময় বাহ্যিক আমলের মান উন্নত করুন এরপর দেখুন! আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সাহায্যের জন্য কিভাবে এগিয়ে আসেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এ সম্পর্কে বলেন, চেষ্টা কর যেন পবিত্র হয়ে যাও। মানুষ নিজে পবিত্র হলে পবিত্রতার সান্নিধ্য পায় অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র সত্ত্বা তাই আল্লাহ্ তাআলাকে পাওয়ার জন্য নিজের পবিত্র হওয়াও খুব প্রয়োজন। হযরত মসীহ

মাওউদ (আ.) বলেছেন, কুরআন করীমে ***‘ওয়াস্তায়িনু বিস সাবরে ওয়াস্ সালাত’*** অর্থাৎ নামায ও ধৈর্য্যের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর, এ কথা বলার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং এর উত্তর দিয়েছেন। নামায কী? এটি হল দোয়া, যা তসবিহ্ (মহিমা কীর্তন), তাহমীদ (প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন) তকদীস (পবিত্রতা ঘোষণা), ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) এবং দুরূদসহ বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করা হয়। কাজেই নামায পড়ার সময় অজ্ঞ লোকদের মত শুধু আরবী শব্দ ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ থেকো না। যারা আরবী জানে না তাদের জন্য মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, মাতৃভাষায়ও দোয়া করা উচিত। কেননা, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, তোমরা নামায পড়ার সময় আল্লাহর কালাম কুরআন ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কালামে বর্ণিত কতিপয় প্রচলিত দোয়া ছাড়াও নিজেদের দোয়াসমূহ বিনয়ের সাথে নিজ ভাষাতেই কর। এমন ভাষা ব্যবহার কর যা বিনয় সৃষ্টি করে। তোমাদের হৃদয়ে যেন সেই সকাতর নিবেদনের সুপ্রভাব পরে। মাতৃভাষায় দোয়া করলে হৃদয় হতে যে সব শব্দ বের হবে এর মাধ্যমে কাতরতার সৃষ্টি হবে এবং সেগুলো হবে হৃদয় নিঙরানো শব্দ। কাজেই দোয়াতে এক বিশেষ ধরণের ব্যাকুলতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এই ব্যাকুলতা সৃষ্টি হলেই আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দার স্বপক্ষে উত্তমরূপে দোয়া কবুল করেন। যেভাবে তিনি বলেন, ***আম মাই ইউজিবুল মুযতাররা ইযা দায়াহু....*** অর্থাৎ যখন সে তাঁর (আল্লাহ্‌র) কাছে দোয়া করে, তখন অসহায় সেই ব্যক্তির দোয়া কে শোনেন এবং তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেন এবং তিনি (আল্লাহ্) সকল দোয়া প্রার্থনাকারীদেরকে একদিন পৃথিবীর উত্তরাধিকারী বানাবেন? অতএব যে সব দোয়া এক বিশেষ অবস্থায় ও ব্যাকুলতার সাথে করা হয় তা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টিকারী দোয়া হয়ে থাকে, যা পৃথিবীতে বিপ্লব ঘটায়। আল্লাহ্ তাআলার রাস্তায় যাদেরকে বিপদাপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় আল্লাহ্ তাআলার কাছে তারা ছাড়া আর কে অধিক প্রিয় হতে পারে! কেননা তারা কেবল তাঁরই জন্য সব দুঃখ-কষ্ট সহ্য করছে। কাজেই আল্লাহ্ তাআলা এ সুস-ংবাদ দিয়েছেন যে, ধৈর্য্য ও দোয়ার মাধ্যমে তোমরা এ সব পরীক্ষা অতিবাহিত কর, একদিন তোমরাই এ পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে। তাই বর্তমানে আহমদীরা, যেভাবে আমি বলেছি বিশেষ করে পাকিস্তানের আহমদীরা যে পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে দিনাতিপাত করছে এবং তারা যে কুরবানী করছেন তা বৃথা যাবে না। আহমদীরা যে কুরবানী করছে তা আজ নয় তো কাল একটি (বিশেষ) রূপ ধারণ করবে। এখন আমাদের কাজ কোন ধরণের অভিযোগ ও অনুযোগ না করে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করতে থেকে এ সব পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে উতরে যাওয়া। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আল্লাহ্ তাআলার জন্য বিপদাপদ ও পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে অতিক্রমকারীর শেষ সীমানা জীবন দেয়ায় গিয়ে ঠেকতে পারে। কিন্তু মনে রেখো আল্লাহ্ তাআলার জন্য যারা জীবন উৎসর্গ করে তাদের আত্মত্যাগ একজন সাধারণ মানুষের নিহত হওয়ার ন্যায় নিহত হওয়া নয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন কোন যুদ্ধ হচ্ছিল না তখনো অসাধারণ সব আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এরপর ইসলামের দ্বিতীয় যুগে যখন মুসলমানদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হল তখনো মু'মিনদের এমন অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যাতে জীবন উৎসর্গ করা হয়েছে। তৌহিদের প্রতিষ্ঠার জন্য তারা নিজেদের প্রাণের নজরানা উপস্থাপন করেছেন। আর খোদা তাআলাও তাদের কুরবানীগুলোকে গ্রহণ করে ঘোষণা দিয়েছেন, এমন লোক যারা নিজেদের প্রাণের নজরানা উপস্থাপন করছে তাদেরকে মৃত বলো না। তারা জীবিত। কেননা তারা এক মহান উদ্দেশ্যের জন্য কুরবানী করেছে।

খোদা তাআলার সমীপে প্রাণ উৎসর্গকারীদের সম্মান একদিকে যেখানে প্রতি মুহূর্তে বেড়ে চলেছে। অপর দিকে মু'মিনদের জামা'ত তাদের এ কুরবানীকে স্মরণ করতঃ তাদের নামকে জীবিত রাখে। আর তা (স্মরণ) রাখা উচিত। কেননা এই শহীদদের নামকে জীবিত রাখা মু'মিনদের জামা'তের জীবনের জন্য নিশ্চয়তার কারণ হয়। জীবন উৎসর্গকারীদের প্রাণের নজরানা উপস্থাপনের এসব উদাহরণগুলোকে সামনে রেখে অন্যান্য মু'মিনরাও ধর্মের জন্য প্রত্যেক প্রকার কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকে। জাতীয় প্রয়োজনে যে জাতিতে প্রাণ বিসর্জনকারী বিদ্যমান থাকে সে জাতি কখনও মরতে পারে না। আর খোদা তাআলার ধর্মের প্রয়োজনে যে প্রাণ উৎসর্গ করবে তার সাথে খোদা তাআলার বিশেষ সাহায্য থাকে।

আজ-মসীহ মাওউদ (আ.) এর এ যুগে ধর্মীয় যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয়েছে। তাই বলে কি খোদা তাআলার রাস্তায় কেউ এখন নিহত হচ্ছে না? হচ্ছে। সে নিহত হওয়ার পর নিজেও চিরস্থায়ী জীবন লাভ করছে এবং মু'মিনদের জীবনেরও উপকরণ যোগাচ্ছে। আর আখারীনদের সাথে যেখানে আওয়ালীনদের সম্পৃক্ত হবার মানদন্ড প্রতিষ্ঠিত করার কথা ছিল সেখানে খোদা তাআলার রাস্তায় প্রাণ উৎসর্গীকরনের দৃষ্টান্তও অবশ্যই উপস্থাপনের কথা ছিল।

সুতরাং এই আখেরীনরা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর জীবদ্দশাতেই কাবুলের মাটিতে প্রাণ উৎসর্গ করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আর প্রাণের নজরানা দিয়ে আমাদেরকে চিরস্থায়ী জীবনের রাস্তা দেখিয়েছেন। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত খোদা তাআলার জন্য জামা'তের সদস্যরা নিজেদের প্রাণের

নজরানা উপস্থাপন করেই যাচ্ছে। আর প্রত্যেক আহমদী শহীদের রক্তের প্রতিটি ফোটা একদিকে তার পারলৌকিক জীবনের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে থাকে অপর দিকে (এর ফলে) জামাতী জীবনের(উন্নতির) উপকরণও সৃষ্টি হতে থাকে।

অতএব, শত্রুরা যদি এমনটা মনে করে যে, তারা জামা'তী জীবনকে প্রভাবান্বিত করছে, ঈমানকে দুর্বল করছে তাহলে এটা শত্রুদের ভুল ধারণা। আল্লাহ তাআলা বলেন তোমরা বুঝতে পারো না। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যে বিপ্লব তাঁর নিজের জামা'তের মাঝে সৃষ্টি করেছেন তা আর্থিক ও প্রাণের ক্ষতি দ্বারা প্রতিহত করা যাবে না, এ বিষয়টি বাহ্য দৃষ্টিতে যারা দেখে তা তাদের কখনোই বোধগম্য হবে না। আল্লাহ্ তাআলা এখন এটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, এ জামা'তেরই মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার দ্বীনকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

অতএব আজও জামা'তের জন্য উৎসর্গকৃত প্রত্যেক শাহাদত জামা'তের প্রত্যেক ছোট, বড়, পুরুষ- মহিলা সব সদস্যের মাঝে এক নতুন জীবন দান করে। প্রত্যেক শাহাদতের পর জামা'তের সদস্যদের পক্ষ থেকে যে চিঠি আমি পাই তাতে নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা প্রদর্শনের ও কুরবানী করার এক নতুন আঙ্গিক উপস্থাপন করা হয়। এ রকম লোকদের বিষয়েই হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, আমি তাদের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা দেখে অবাক হই ।

অতএব আহমদীদের প্রাণ ও ধন সম্পদের ক্ষতি করার ফলে আহমদীরা নিজেদের ঈমান থেকে সরে যাবে, এটা বিরোধীদের ভুল ধারণা । কখনও নয়। বরং আমি যেভাবে বলেছি প্রত্যেক পরীক্ষা ঈমানে দৃঢ়তা সৃষ্টি করে। অথবা বিরোধীরা মনে করে তাদের এ বিরোধীতা আহমদীয়াতকে ধ্বংস করে দিবে, এটা তাদের অলীক ধারনা। পাকিস্তান বা অন্য কিছু দেশে কতিপয় আইনের কারণে তবলীগের ক্ষেত্রে জামা'তের প্রতি বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়েছে। তবে জামা'তের বিরোধীতার কারণে প্রকাশিতব্য ঘটনা প্রবাহ আমাদের জন্য তবলীগের রাস্তা খুলে দেয়। অনেক লোক সরাসরি এখানে চিঠি লিখে বয়আতের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। পাকিস্তান থেকেও এবং আরবের অন্যান্য দেশ থেকেও। সুতরাং এ বিরোধীতাও আমাদেরকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এই বিরোধীরা আমাদের কিছু প্রাণ হরণ করতে পারে, সম্পদ লুটে নিতে পারে, আমাদের বাড়ি-ঘরের ক্ষতি করতে পারে, আমাদের মসজিদের নির্মানকাজ বন্ধ করে দিতে পারে, কিন্তু আমাদের ঈমানকে কখনও দুর্বল করতে পারবে না। কেননা এ পরীক্ষা ও বিপদাবলী এই বিষয়ের সত্যায়ন করে- খোদা আমাদের সাথে আছেন। যেভাবে খোদা তাআলা পরবর্তী আয়াতে সব ধরনের ক্ষয়-ক্ষতির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে ধৈর্য্যশীলদের সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ভয়ভীতি দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা নিব। কিন্তু তোমরা ধৈর্য্য ও দোয়ার মাধ্যমে এ পরীক্ষা অতিক্রম করলে তোমাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। তোমরা পুরষ্কারাদীর উত্তরাধিকারী হবে। আর এ ভয়-ভীতিগুলো কী? এগুলো হলো প্রতি মুহূর্তে শত্রুর আক্রমণের ভয়, মৌলভীদের দুষ্টামীর ভয়, সামান্য কথায় মামলা হওয়ার ভয়, রাষ্ট্রের আইনের ভয় এবং রাজ্যের শাসকদের হুমকির ভয়। কিন্তু কোন দল ও পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তের ভয়ে অথবা আমি যা বলেছি এগুলোকে ভয় পেয়ে মু'মিন নিজের ঈমানকে নষ্ট করে না এবং এতে দুর্বলতাও সৃষ্টি হতে দেয় না।

আবার ক্ষুধার মাধ্যমে পরীক্ষা নেয়া হবে। এর ব্যাপক দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। দু'একটি এমন ঘটনা এখনো ঘটে থাকে। কিন্তু '৭৪-এ জামা'তের বিরুদ্ধে যে অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং আহমদীদের ওপর যে বল প্রয়োগ করা হয়েছিল তাতে আহমদীদের ঘরে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছানোর অনুমতি কারো ছিল না। আর ঘরের বাইরে গিয়ে আহমদীরা বাজার থেকে সওদা নিয়ে আসতে পারে, এরও অনুমতি ছিল না। বের হতে পারলেও দোকানদারদের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল তারা কোন প্রকার খাদ্যসামগ্রী আহমদীদের কাছে বেচতে পারবে না।

তারা মালামাল লুটে নেয়। বর্তমানেও আহমদীদের মালামাল লুট করার বা দখল করার যে সম্ভাব্য চেষ্টাসমূহ রয়েছে তা করা হয়। কোন আহমদী নিজের সম্পদ উদ্ধারের জন্য আইনগত ভাবে কোন চেষ্টা করলে অনেক সময় এ ব্যক্তি কাদিয়ানী বলে এমন অবস্থার সৃষ্টি করে দেয়া হয় যে, এ ব্যক্তি কাদিয়ানী বা আহমদী তা জেনে ন্যায়বিচারের আসনে বসা অনেক ব্যক্তি অথবা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তারা আহমদীদের সাথে ন্যায়ানুগ আচরণ করে না। রাবওয়ার জমির এক অংশ '৭৪- সালে সরকার জামা'তের কাছ থেকে নিয়ে মৌলভীদের দিয়ে দেয় অর্থাৎ দখলে দিয়ে দেয় যেখানে আজ মুসলিম কলোনী নামে বসত বাড়ী বনানো হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে জামা'তের টি. আই কলেজের নতুন ক্যাম্পাস সংলগ্ন কৃষি জমি এবং রাবওয়ার 'দারুন নাসের' এর একটি খোলা মাঠের ব্যাপারে সরকার এরূপ সিদ্ধান্ত নেয়, এটা আমাদের জায়গা জোরপূর্বক তারা দখল করে নেয়। । আবার সন্তান সন্ততি ও প্রাণের মাধ্যমে পরীক্ষা নেয়া হয়। সন্তানদের শিক্ষার ক্যারিয়ার নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়। স্কুলে বাচ্চাদেরকে এমন ভাবে হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যস্থল বানানো হয় যে, বাচ্চারা মনমরা হয়ে স্কুলেই যায় না। ফয়সালাবাদ মেডিকেল কলেজে কিছুদিন

পূর্বে এরূপ ঘটনাই ঘটেছিল। ছাত্রদেরকে পড়াশুনা করায় বাধা দেয়া হয়েছিল। সবাই জানেন **লাইয়্যাতে** নির্যাতন করে চার বাচ্চাকে জেলে পাঠানো হয়। বাচ্চাদের পিতা মাতা যদি আহমদীয়াত থেকে বিচ্যুত হওয়ার ঘোষনা দিত তাহলে মৌলভীরা বাচ্চাদের বিরুদ্ধে রাসূল অবমাননার যে মামলা করেছিল তা তৎক্ষণাৎ পরিবর্তন হয়ে যেত। কেননা তারা এটাই চায়। আহমদীরা কোনভাবে ভয় পেয়ে নিজের ঈমান থেকে যেন সরে পড়ে। আহমদীদেরকে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষায় ফেলে তাদেরকে আহমদীয়াত থেকে সরিয়ে দেয়াই হল–এদের চাল । কিন্তু তারা জানে না, আহমদীরা তো সত্যিকার মুসলমান এবং কুরআন করীমের প্রতিটি অক্ষরের ওপর ঈমান রাখে। খোদা তাআলা তাদেরকে প্রথমেই তা বলে দিয়েছেন যে তোমাদের অমুক অমুক বিষয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হবে।

সুতরাং দৃঢ় প্রত্যয় থাকা, পরিণামের প্রতীক্ষা করা এবং প্রত্যেক বিপদে ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন*** অর্থাৎ আমরা আল্লাহর-ই এবং আমরা তাঁর দিকেই ফিরে যাব বলাই হল আহমদীদের রীতি-নীতি। যে কষ্ট দেয়া হয় বা দেয়া হবে এর ওপর ধৈর্য্য ধরাই হলো আসল বিষয় যা আহমদীদের সত্যে পরিণত করে দেখাতে হবে। আর ধৈর্য্য ধারণ করা এটাই যে, অবশ্যই দুঃখ অনুভব কর কিন্তু এ দু:খের কারণে নিজের চেতনা ও অনুভূতি কখনো বিসর্জন দিবে না এবং কখনো অভিযোগ ও অনুযোগ করবে না। বরং প্রত্যেক ক্ষতিতে এবং পরীক্ষায় খোদা তাআলার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে এবং এ বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হবে, নি:সন্দেহে এটা এক পরীক্ষা কিন্তু তা সাময়িক। এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা আমার অনুকুলে ভাল কিছুই করবেন, ইনশা আল্লাহ তাআলা! প্রত্যেক প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সময়ে এ চিন্তা ধারা পোষণ করতে হবে, আমার প্রাণ, আমার সন্তান সন্ততি, আমার সম্পদ, আমার জায়গা জমি এ সবই ইহজগতের সাময়িক বস্তু। আর এগুলো খোদা তাআলার জন্য উৎসর্গ করা হলে আগের চাইতেও অধিক খোদা তাআলার আশীষ ও কল্যাণের আমি অংশীদার হবো। মানুষ যখন **"ইন্না লিল্লাহ"** বলে তখন সে যেন এ দৃঢ় প্রত্যয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, আমরা আল্লাহ তাআলার জন্যই এবং আমাদের ধন সম্পদ ও সন্তানাদিও আল্লাহ তাআলার। সুতরাং তিনি যদি আমাদের কাছ থেকে তার দেওয়া আশীষসমূহ ফেরত নেন, তাতে আমাদের দু:খ-কষ্ট পাওয়া এবং কান্না কাটি করা উচিত নয়। কেননা **"ইন্না ইলাইহে রাজেইন"** অর্থাৎ 'আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হব' বলে সে স্বীকারোক্তি প্রদান করে। আর যেহেতু আমরা আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হব তাই আল্লাহ তাআলা অঙ্গীকার প্রদান করেছেন, পারলৌকিক জীবনে তোমরা পার্থিব দুনিয়ার চাইতে উত্তম জিনিস লাভ করবে। সুতরাং একজন মুমিনের অবস্থা এমন হলে পার্থিব ক্ষয় ক্ষতি তার জন্য সাময়িক কষ্টের কারণ হতে পারে কিন্তু এটি তার জীবনে চিররোগের আকার ধারণ করতে পারে না।

হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, তোমরা মুমিন হয়ে থাকলে পরীক্ষা সমূহকে মন্দ জ্ঞান করো না। যে পরিপূর্ণ মুমিন নয় সে-ই একে মন্দ জ্ঞান করবে। কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে **"ওয়ালা নাবলুওয়ান্নাকুম বিশাইয়িম মিনাল খাওফে .... সাবেরীনাল্লাজীনা ইযা আসাবাতহুম মুসিবাহ্ ক্বালু ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন"** আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমরা তোমাদেরকে কখনো কখনো ভয়-ভীতি, ক্ষুধা, ধন-সম্পদ, সন্তানাদীর ও ফলমূলের ক্ষয়-ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা নিব। কিন্তু যারা এসব পরিস্থিতিতে ধৈর্য্য ধারণ করবে ও কৃতজ্ঞ থাকবে তাদেরকে এ সুসংবাদ দাও যে তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার রহমতের দুয়ার প্রশস্ত এবং তাদের ওপর আল্লাহর আশীষ বর্ষিত হবে। যারা এমন পরিস্থিতিতে **"ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন"** বলে । অর্থাৎ আমরা ও আমাদের সাথে সম্পর্কীত সব কিছুই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এবং পরিশেষে এ সব কিছুই আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। *কোন ধরনের ক্ষয় ক্ষতির যাতনা তাদের হৃদয়কে কুড়েঁ কুড়েঁ খায় না এবং তারা সন্তুষ্টির মর্যাদায় সমাসীন থাকে। তারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকে এবং তাতে তুষ্ট থাকতে পছন্দ করে ও তাতে অবস্থানও করে থাকে। এরাই ধৈর্য্যশীল এবং ধৈর্য্যশীলদের জন্য আল্লাহ তাআলা অগণিত পুরষ্কার রেখেছেন।* সুতরাং আহমদীদের প্রতিক্রিয়া এমনই হওয়া উচিত এবং আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে জামা'তের সদস্যগণ আজ পর্যন্ত এমনই প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে আসছেন। আর এ প্রতিক্রিয়াই হলো আমাদের উন্নতির নিদর্শন। এজন্য আল্লাহ তাআলার সমীপে সর্বদা দোয়ায় রত থাকা উচিত। বিপদ আপদ ও পরীক্ষা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অবশ্যই দোয়া করতে থাকা প্রয়োজন। কিন্তু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোন পরীক্ষা বা বিপদ এসে পড়লে দৃঢ়তা অবলম্বন করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ কাজই তাকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সীমাহীন প্রতিদানের উত্তরাধিকারী বানাবে। 'আল্লাহ তাআলা ধৈর্য্যশীলদের সাথে আছেন' কথাগুলো উল্লেখ করার পর তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ তাআলার পথে শাহাদতের মর্যাদা অর্জনকারীগণ চিরস্থায়ী জীবন লাভ করে এবং ধৈর্য্যশীলদের জন্য মহা সুসংবাদ রয়েছে কারণ তারা নিজেদের সন্তুষ্টিকে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির অনুগত বানিয়ে নিয়েছে। প্রত্যাদিষ্টগণ ও তাদের

জামা'তের ওপর যে বিপদাবলী ও পরীক্ষা এসে থাকে এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, কোন এমন প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি নেই যিনি পরীক্ষায় পড়েন নি। মসীহ (আ.) কে বন্দী করা হয়েছে এবং বহুবিধ কঠিন কষ্ট দেয়া হয়েছে। হযরত মূসা (আ.) এর সাথে কেমনতর আচরণ করা হয়েছে এবং মহানবী (সা.) কে অবরুদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, এ সব কষ্টের পরিনাম উত্তম হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তাআলার রীতি যদি এমন হতো যে, প্রত্যাদিষ্টদের জীবন স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও আরাম আয়েশের হবে এবং তার জামা'তের লোকেরা পোলাও কোর্মা খাবে তবে অন্যান্য দুনিয়াদার ও তাদের মধ্যে পার্থক্য কী রইল ! জীবন যদি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম আয়েশের হয় এবং কোন দু:খ কষ্ট সহ্য করতে না হয়, তবে দুনিয়াদারদের সাথে ঐশী জামা'তের (সদস্যদের) তুলনামুলক স্বাতন্ত্র্য কি রইল? তিনি (আ.) বলেছেন, পোলাও-জর্দা খেয়ে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সহজ। আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে বিষয়াবলী সহজ হতে সহজতর হতে থাকলে এবং খাওয়া দাওয়া সহজলভ্য হলে তাঁর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা অতীব সহজই হতো। যে কোন সহজ সরল লোক এমনটি বলতে পারে। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পরীক্ষা ও বিপদ এলে, আশীষসমূহ লাভ করার পর যেভাবে তাঁর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আদায় করা হয় ঠিক সেই হৃদয় নিয়ে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা বিপদকালেও আদায় করা উচিত। আর এটিই হল মূল কথা। তিনি (আ.) বলেছেন, প্রত্যাদিষ্ট ও তাঁদের জামা'তের ওপর ভূমিকম্প আসে, ধ্বংসের আশঙ্কা দেখা দেয়, বিভিন্ন ধরনের বিপদ আপদের সম্মুখীন হতে হয়। **"কাযাবু"** এর অর্থ এটাই। অপরদিকে এর মাধ্যমে দুর্বল ও সবল প্রকৃতির লোকদের যাচাই করা হয়ে যায়। যারা দুর্বল তাদের পদচারণা সাচ্ছন্দ্য কাল পর্যন্ত থাকে এবং বিপদ এলে তারা পৃথক হয়ে যায়। এটাই হলো দুর্বল ও সবল ঈমানদারদের মধ্যে পরীক্ষা। বিপদ এলে তাদের পদক্ষেপ থেমে যায়। কিন্তু যারা দৃঢ় ইমানের অধিকারী তারা বিপদের সময়েও সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে। তিনি (আ.) বলেছেন, আমার সাথে খোদা তাআলার রীতি হলো পরীক্ষা না আসা পর্যন্ত নিদর্শন প্রকাশিত হয় না। খোদা তাআলা বান্দাকে পরীক্ষায় নিপতিত করার মাধ্যমে বান্দার সাথে তাঁর ভালবাসার প্রকাশ করেন। যেভাবে তিনি বলেছেন, ***"ওয়া বাশ্বিরিস সাবেরীনা ল্লাযীনা ইযা আসাবাতহুম মুসিবাতুন ক্বালু ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন"*** অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকার দু:খ কষ্টে তারা খোদা তাআলার দিকে ঝুঁকে এবং খোদা তাআলার পুরস্কার তারাই অর্জন করে, যারা দৃঢ়তা প্রদর্শন করে। আনন্দের দিন সমূহ দেখতে যদিও সুন্দর, কিন্তু এর পরিণামে কিছুই লাভ হয় না। খেলা-তামাশায় মত্ত থাকলে খোদা তাআলার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। আনন্দ উচ্ছাসে ও খেলা-তামাশায় মত্ত থাকলে খোদা তাআলার সাথে সম্পর্ক কর্তিত হয়ে যায়। আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা এটাই যে, তিনি পরীক্ষায় নিপতিত করেন এবং এর মাধ্যমে বান্দার মর্যাদা প্রকাশ করেন। এ পরীক্ষার মাধ্যমে বান্দার ঈমানের দৃঢ়তা, মর্যাদা ও মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। যেমন কিসরা (ইরানের বাদশাহ্) যদি মহানবী (সা.) কে গ্রেফতারের নির্দেশ না দিত তবে সে রাতেই তার মারা যাওয়ার নিদর্শন কিভাবে প্রকাশ হত! আর মক্কাবাসীরা যদি তাঁকে (সা.) বিতাড়িত না করত, তবে ***"ফাতাহনা লাকা ফাতহাম মুবীনা"*** এ আওয়াজ কিভাবে শোনা যেত! প্রত্যেক নির্দশন বিপদাবলীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত এবং উদাসীনতা ও আরাম আয়েশের জীবনের সাথে খোদা তাআলার কোন সম্পর্ক নেই। একের পর এক সফলতা ও আনন্দ লাভ হতে থাকলে তো অনুনয়-বিনয়ের সাথে কোন সম্পর্কই থাকে না, অথচ আল্লাহ তাআলা এগুলোকেই পছন্দ করেন। তাই বেদনাদায়ক অবস্থার সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। সুতরাং আল্লাহ তাআলা বলেছেন তিনি ধৈর্য্যশীলদের সাথে আছেন এবং যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিহত হয় তারা চিরস্থায়ী জীবন লাভ করে। ধৈর্য্যশীলগণের জন্য আল্লাহ তাআলা সুসংবাদ দিয়ে থাকেন। এ সব কথা বলার পর অর্থাৎ আমি যে সব আয়াত তিলাওয়াত করেছি এর শেষ আয়াতে আল্লাহ তাআলা এ কথাগুলোরই পুনরাবৃত্তি করেছেন যে, এদেরই জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কল্যাণ ও অনুগ্রহ রাজী নির্ধারিত রয়েছে। আর যারা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও কল্যাণ রাজীর উত্তরাধিকারী হয়, তারাই হেদায়াত প্রাপ্ত। কেননা ***"সালাওয়াতুম মির রাব্বিহীম"*** শব্দ ব্যবহার হয়েছে। এ জন্য এর অর্থ হবে কল্যাণরাজী ও করুণা। অর্থাৎ ধৈর্য্য ও দোয়ার মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনাকারীগণ আল্লাহ তাআলার কল্যাণ ও করুণার এমন দৃশ্য দেখবে, যা তাদের আধ্যাত্মিক মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। ***সালাওয়াতুম মির রাব্বিহিম ওয়া রাহমা***

আনন্দের দিন সমূহ দেখতে যদিও সুন্দর, কিন্তু এর পরিণাম কিছুই লাভ হয় না। খেলা-তামাশায় মত্ত থাকলে খোদা তাআলার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। আনন্দ উচ্ছাসে ও খেলা-তামাশায় মত্ত থাকলে খোদা তাআলার সাথে সম্পর্ক কর্তিত হয়ে যায়। আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা এটাই যে, তিনি পরীক্ষায় নিপতিত করেন এবং এর মাধ্যমে বান্দার মর্যাদা প্রকাশ করেন।

এর অর্থ শুধু মাত্র দোহাই দেয়া নয় বরং মুমিনদের কাছ থেকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দয়া ও ক্ষমা পৌঁছবে। (তাদের কাছে) যখন (আল্লাহ্ তাআলার) অনুগ্রহ ও আশিস পৌঁছতে থাকে তখন এ সব লোকদের আধ্যাত্মিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আল্লাহ তাআলার কৃপাও তাদের সাথে থাকবে। আল্লাহ তাআলার জন্য সব ধরনের আত্মত্যাগ করতে যারা প্রস্তুত থাকে এমন লোকদের পার্থিব ক্ষয়-ক্ষতিও আল্লাহ তাআলা পুষিয়ে দিয়ে থাকেন। পর্যবেক্ষণ করে দেখুন, বিরুদ্ধবাদীরা তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সে সব আহমদীদের হাতে ভিক্ষার ঝুলি ধরাতে পারে নি যারা আল্লাহ তাআলার পথে সব ধরনের কুরবানী করে থাকে। বরং যারা আহমদীদের কষ্ট দিয়েছে এবং আইনের প্রয়োজনে আহমদীদের অমুসলিম ঘোষনা করেছে পরিনামে তাদের হাতেই ভিক্ষার ঝুলি উঠেছে।

সুতরাং আল্লাহ তাআলার এই সুস্পষ্ট সাহায্য ও সমর্থনের দৃশ্য দেখার পরও যদি কেউ বুঝতে না পারে বা বুঝতে না চায়, তবে কেউ তাদের বোঝাতে পারবে না। আমরা কেবল এ দোয়া করতে পারি যে, আল্লাহ তাআলা এসব লোককে বোধশক্তি ও জ্ঞান দান করুন। অত:পর এ আয়াতের শেষে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ***“উলাইকা হুমুল মুহতাদুন”*** অর্থাৎ যে সব লোক আল্লাহ তাআলার দয়া, কৃপা ও করুনা লাভ করবে তারাই প্রকৃত হেদায়াত প্রাপ্ত এবং হেদায়াত প্রাপ্তির কারনে হেদায়াতের ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করতে থাকবে। যেহেতু এ সব লোক বিপদাবলী ও পরীক্ষার সময় আল্লাহ তাআলার নিকট ধৈর্য্য ও দোয়ার মাধ্যমে সাহায্য কামনা করে, এজন্য আল্লাহ তাআলা তাদের হেদায়াত দান করেন আর তাই আমি বলেছি এতে উন্নতি করতে থাকে। তাদের আল্লাহ তাআলার সাক্ষাত লাভের নতুন নতুন পথ দেখানো হয়। তারা সর্বদা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করে থাকে।

আল্লাহ্ তাআলা যেন প্রত্যেক আহমদীকে তাঁর নিজ অনুগ্রহে বিপদাবলী থেকে রক্ষা করেন আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বদা এ দোয়া করতে থাকা উচিত কিন্তু ঐশী বিধান অনুযায়ী যদি কাউকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতেই হয় তবে আল্লাহ তাআলা যেন ধৈর্য্য ও দোয়ার মাধ্যমে তা অতিক্রম করার সৌভাগ্য দান করেন এবং সর্বদা আমাদের পথ প্রদর্শন করতে থাকেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন যখন আমি আপনাদের এ কষ্ট দেখি আর অন্য দিকে আল্লাহ তাআলার এ সম্মানিত শক্তিকে আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছি, আর যা আমার প্রতি আরোপিত হয়েছে তা আমাকে একেবারেই বিচলিত করে না, কেননা আমি জানি আল্লাহ তাআলা সম্মানিত ও অতীব ক্ষমতাবান । আর বড় বড় সমস্যা এবং কাঠিন্য থেকে তিনি পরিত্রান দান করেন। আর যার আধ্যাত্মিকতাকে বৃদ্ধি করতে চান অবশ্যই তার ওপর বিপদ আপতিত করেন। যেন সে বুঝতে পারে তিঁনি নিরাশার স্থলে আশা সঞ্চার করতে পারেন। সুতরাং তিঁনি নিশ্চিত ক্ষমতাধর সম্মানিত এবং দয়াশীল। এ পরীক্ষার কারণে এটা মনে করা উচিত নয় যে আল্লাহ তাআলার কল্যাণ আমাদের থেকে দূরীভূত হয়ে গেছে। এ পরীক্ষার মাঝেও তিনি সম্মানদাতা ও কৃপাকারী। তিনি (আ.) আরও বলেন বিপদাবলী যতই কঠিন হোক আল্লাহ তাআলার কল্যাণের রাস্তা সর্বদা খোলা রয়েছে। তাঁর রহমতের আশা রাখা উচিত। হ্যাঁ সেই অস্থিরতার মুহূর্তে তওবা এবং ইস্তেগফারের খুবই প্রয়োজন। এই বিষয়টি স্মরণ রাখার যোগ্য। যে ব্যক্তি কোন পরীক্ষা অবতীর্ণ হবার সময় কোন এমন ত্রুটি এবং গুনাহকে গ্রহনীয় তওবা অনুযায়ী পরিত্যাগ করে দেয় যা এত দ্রুত পরিত্যাগ করা তার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তবে এ আমল তার জন্য বড় প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়। যদি কোন বিপদ আসে যদি কোন সমস্যা আসে পরীক্ষা আসে তার কারনে যদি কেউ তার কোন মন্দ বিষয় পরিত্যাগ করে কোন গুনাহকে পরিত্যাগ করে এবং এর থেকে শিক্ষা নেয় তবে তিঁনি বলেন এটি তার জন্য বড় প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়। আর তার হৃদয় উন্মুক্ত হবার সাথে সাথে ঐ বিপদের আধার দূরীভূত হয়ে যায়। আর আশার আলো দৃশ্যমান হয়। আর যেখানে এরূপ হয়, যেখানে মানুষের বক্ষ উন্মুক্ত হয়, ঐ পরীক্ষার কারণে যে অন্ধকার বিস্তৃত হয়েছে, তা আলোকে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর আলোকের আশা সৃষ্টি হয়ে যায়। সুতরাং আজকাল যে অবস্থা যেভাবে আমি বলেছি, বিশ্বের সকল স্থানের জামা'তের সদস্যদেরকে দোয়ার প্রতি দৃষ্টি দেয়া খুব বেশী প্রয়োজন। নিজ ভুল ত্রুটির দিকে দৃষ্টি রাখা খুব বেশী প্রয়োজন। আর আল্লাহ তাআলার সাহচর্য অর্জনের চেষ্টা করা প্রয়োজন। জামা'তের সদস্যরা যখন ব্যক্তিগত ভাবে চেষ্টা-প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয় তখন সেগুলো একত্রিত হয়ে জামা'তী রূপ ধারণ করে। আর সেসব যখন একত্রিত হয়ে আকাশের দিকে যায় তখন আল্লাহ তাআলার রহমত ও বরকত আকর্ষণ করে নিয়ে ফেরত আসে। আল্লাহ তাআলা জামা'তের প্রত্যেক সদস্যকে এ তত্ত্বের সাথে বিশেষ দোয়ার তৌফিক দান করুন। কেননা অবস্থা যে দিকে যাচ্ছে মনে হচ্ছে এখন যথেষ্ট পরীক্ষার মাধ্যমে বিশেষ করে পাকিস্তানের আহমদীদেরকে অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু এ অবোধেরা এটি বোঝেনা, তারা মনে করে সহজ লক্ষ্যস্থল আহমদীরা দেশে যে অন্যান্য বিভেদ তা শেষ করতে আহমদীদের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করে দিলেই এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু আমি যেভাবে বলেছি ঐ অবোধদের জানা নেই যে তারা

আহমদীদেরকে ক্ষতি করছেনা বরং অবচেতন ভাবে সেই লোকদের হাতের পুতুল হয়ে যাচ্ছে যারা দেশকে টুকরো টুকরো করতে চায় আর দেশের ক্ষতি করার চেষ্টায় রত। সুতরাং পাকিস্তানের জন্য খুব বেশী দোয়ার প্রয়োজন, আল্লাহ তাআলা দয়া করুন। আজ আমি আরও এক শহীদের জানাযা পড়াব। যাকে বিগত দিনে শহীদ করা হয়েছে। তার নাম মোহাম্মদ আজম তাহের সাহেব। কুচ শরীফের অধিবাসী। তার পিতার নাম হাকিম মোহাম্মদ সাহেব । ২৬ সেপ্টেম্বর তাকে শহীদ করা হয়েছে। *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন*।

তার ভাইয়ের বাড়ীতে কোন এক সন্তানের বিয়ে ছিল, সেখানে অংশগ্রহন করে তিনি তার মেয়ে ও মেয়ের সন্তানদেরকে নিয়ে ফেরত আসছিলেন সাড়ে আটটার দিকে। রাস্তায় এক জায়গায় যেখানে বসতি কম ছিল, দুই ব্যক্তি তাকে পিস্তল উঁচিয়ে থামালে, তিনি তার মোটর সাইকেলের ব্যালেন্স রাখতে না পেরে পড়ে গেলেন। মেয়ে এবং সন্তানরা মাটিতে পড়ে যায়। তিনি যখন বাচ্চাদেরকে উঠানোর জন্য অগ্রসর হলেন তখন হামলাকারীরা তার খুব নিকটে চলে আসলো আর তার কানের পাশে পিস্তল ঠেকালো। তিনি বললেন, তোমাদের যা নেয়া দরকার নিয়ে নাও আর বন্দুক সরাও। কিন্তু তারা সেখানেই তার কানের পাশে পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করলে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন।

তিনি চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন এবং নিজ এলাকায় খুবই প্রিয়ভাজন ছিলেন। তিনি ওসিয়্যতকারীও ছিলেন। তার বয়স হয়েছিল ৫১ বছর। খুব সচ্চরিত্রবান, আত্তোৎসর্গকারী, জামা'তের মুখলেস কর্মকর্তা ইতাআ'তকারী, মেহমান নেওয়াজী, নিয়মিত দোয়া ও নামায আদায়কারী, ইদানিং সেক্রেটারী মালের দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করছিলেন। তিনি দুই ছেলে এবং এক কন্যা উত্তরাধিকারী রূপে রেখে গেছেন। এভাবে আরও রয়েছে তার পাঁচ ভাই - জানানো। আর তার এক ভাই মুরব্বী সিলসিলায় অন্তর্ভুক্ত। তার পিতা জীবিত আছেন। আল্লাহ তাআলা শহীদের পিতা-মাতা ও সন্তানদেরকে ধৈর্য এবং দোয়ার সাথে এ আঘাত ও মনোবেদনা সহ্য করার তৌফিক দান করুন। তাদের প্রিয় আর আমাদেরও প্রিয় আল্লাহ তাআলার পথে যারা শহীদ হচ্ছেন তাদের কারনে আমাদের প্রত্যেকের ঈমানে দৃঢ়তা সৃষ্টি হতে থাকুক আর আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি হোক। আরও দু-জন শহীদ হয়েছেন। যারা জামা'তী কারণে শহীদ তো হননি, তবে আজ কাল দেশে যে অরাজকতা সাধারণ ব্যাপার এবং খুব দ্রুততার সাথে দেশে বিস্তৃতি লাভ করছে আর দেশকে দু-ভাগ করার দিকে লোকেরা অগ্রসর হচ্ছে, বিভক্ত করার দিকেই তারা আগুয়ান। এ অরাজকতার শিকার হওয়ায় এ দুজন শহীদ হয়েছেন। এক- রিয়াজ আহমদ সাহেব আর একজন ইমতিয়াজ আহমদ সাহেব এরা দু-ভাই। আর পেশোওয়ারে ব্যাঙ্কের নিকটে যে বোম-ব্লাস্ট হয়েছে সেই পথ ধরে তারা চলছিল, ঘটনাস্থলেই তারা শহীদ হয়ে গেলেন, *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন*। এক জনের বয়স ছিল চল্লিশ বছর, তিনি বিবাহিত ছিলেন এবং তার দুটি সন্তান আছে আর দ্বিতীয় ভাইয়ের বয়স ছিল ২০ বছর । শহীদের জানাজার সাথে জুমুআর পর এদেরও জানাজা আমি পড়াব। একই ভাবে আরও একটি জানাজা আছে। যিনি ইউ.কে জামা'তের সাবেক সদর ও ন্যাশনাল আমীর। ২৭ সেপ্টেম্বর তিনি ওফাত লাভ করেছেন। তিনিও দীর্ঘ দিন ইউ.কেতে ছিলেন আর যেভাবে আমি বলেছি ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টও ছিলেন এবং জামা'তের আমীরও ছিলেন। ইউ.কের কাযা বোর্ডের সদরও ছিলেন। প্রথমে তিনি ঢাকাতে ছিলেন, এর পূর্বে তিনি কলকাতাতেও ছিলেন সেখানের আমীর ছিলেন, ঢাকাতে আমীর ছিলেন, ফজলে ওমর ফাউন্ডেশনের সদস্য ছিলেন। চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেবের সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তার সেক্রেটারী হবার সুবাদে বিভিন্ন সফরে তার সাথে বিভিন্ন জায়গায় তিনি গিয়েছেন,খলিফাতুল মসীহ রাবে '৮৩-তে যখন এখানে এসেছেন, তখন কুরআন করিম ইংরেজী তর্জমার ভুল সংশোধনের যে টিম বানানো হয়েছিল সেখানে তাকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন । খিলাফতের সাথে তার বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। ওয়াকেফে জীন্দেগী এবং মোয়াল্লেমদেরকে খুব সম্মান করতেন। আল্লাহ তাআলা তার সাথে ক্ষমার আচরণ করুন দয়ার আচরণ করুন। আরও একটি জানাজা রয়েছে, এক আমাদের সম্মানিতা মানসুরা ওহাব সাহেবা। আব্দুল ওহাব সাহেব যিনি ঘানার অধিবাসী জামেয়া রাবওয়াতে পড়েছেন। আফ্রিকা থেকে প্রথমে যারা পড়তে গেছেন তাদের মাঝে তিনি একজন। ইনি তার কন্যা। বর্তমানে আব্দুল ওহাব সাহেব যিনি ঘানার আমীর এবং মিশনারী ইনচার্য, মোহাম্মদ বেগম সাহেবার পরিবারভূক্ত ছিলেন। তার কিডনীর সমস্যা ছিল যার কারনে অসুস্থ থাকতেন। কিছুদিন পূর্বে কিডনী স্থানান্তরের ব্যবস্থাও করা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু আল্লাহ তাআলার তকদির এই ছিল ২৮ বছর বয়সে তার ওফাত হয়েছে *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন*। একই সাথে তারও জানাজা পড়ানো হবে। আল্লাহ তাআলা তার সাথেও ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন, আর তার পিতা-মাতাকে ধৈর্য্য ধারণ করার তৌফিক দান করুন।

[জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ কর্তৃক অনুদিত]

বয়আতের শর্তসমূহ এবং একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)

(পূর্ব প্রকাশের ধারাবাহিকতায়)

বয়আত গ্রহণের তৃতীয় শর্ত

বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রাসূল (সা.) এর নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়বে, রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ পাঠ করবে, প্রত্যেহ আল্লাহ্ তাআলার সমীপে নিজের পাপসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর প্রতিনিয়ত ইস্তেগফার করায় মনোনিবেশ করবে। ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে তাঁর প্রশংসা ও বড়াই করবে।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায সযত্নে লালন করো

বয়আত গ্রহণের এই শর্তে যে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে তাতে নামায তো এমনই এক বিষয় যে, আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্তের নামায বিনা ব্যতিক্রমে আদায় করবে। *“নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায় করো”*-আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.)-এর এ নির্দেশ নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য অবশ্য পালনীয়। আর সেই সব ছেলেমেয়েদের জন্যও যাদের বয়স দশ বছরে উপনীত হয়েছে। পুরুষদের জন্য এ নির্দেশ রয়েছে যে, জামা'তের (বা-জামা'ত) সাথে নামায আদায়ের বন্দোবস্ত করো, মসজিদে যাও আর তা জনাকীর্ণ করে রাখো, এর আশিস অন্বেষণ করো, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ব্যাপারে কোন ছাড় নেই। তবে ভ্রমণকালে কিছুটা ছাড় তো রয়েছেই আর রোগাক্রান্ত অবস্থায়ও ছাড় আছে আর বলা হয়েছে যে **‘জমা’** করে নাও–**‘কসর’** পড়ো, অধিকন্তু রোগাক্রান্ত অবস্থায় মসজিদে না যাওয়ার ব্যাপারে যে ছাড়টি রয়েছে তা থেকে ধারণা হয়ে যাওয়া উচিত যে, বা-জামা'ত নামায আদায় করার তাৎপর্য কতটা ব্যাপক। এর তাৎপর্যের বিষয়ে আমি এখন বিস্তারিত কিছু উদ্ধৃতি পাঠ করছি তবে এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাইছি যে, **প্রত্যেক বয়আতকারীর আত্ম-বিশ্লেষণ করা উচিত যে, ‘আমি নিজ সত্তাকে রক্ষা করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি বটে, তবে আমি কী সেভাবে কুরআনের নির্দেশাবলী পালনে যথার্থ আজ্ঞানুবর্তিতাও করছি!’ প্রত্যেক আহমদী নিজ আত্মার সংশোধনার্থে নিজেই নিজের অভিভাবক, নিজেই নিজের হিসাব নিন, নিজেই নিজেকে অভিনিবেশ সহকারে দেখুন। যদি আমরা নিজেরাই নিজ সত্তাকে, নিজ অন্তরাত্মাকে যাচাই করতে লেগে যাই তাহলে এক মহা বিপ্লব সাধিত হতে পারে।**

কুরআন করীমে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন–

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

ওয়া আক্বিমুস্সালাতা ওয়া আতুয্যাকাতা ওয়া আতীউ'র্ রাসূলা লাআ'ল্লাকুম তুরহামুন–

(সূরা আন নূর : ৫৭)

অর্থাৎ নামায প্রতিষ্ঠিত করো ও যাকাত আদায় করো এবং এই রসূলের আনুগত্য করো যাতে তোমাদের প্রতি রহম করা যায়।

আবার সূরা ত্বাহা-এর ১৫ নং আয়াতে রয়েছে–

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

ইন্নানী আনাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আনা ফাআ'বুদনি ওয়া আক্বিমিস সালাতা লিযিকরী–

অর্থাৎ অবশ্য আমি-ই আল্লাহ্, আমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। তাই আমারই ইবাদত করো আর আমার যপ-গাঁথা করতে নামায প্রতিষ্ঠা করো। আর এভাবে নামায সম্পর্কে অনেকবার কুরআন মজীদে নির্দেশাবলী এসেছে। এ সম্পর্কিত একটি হাদীস আমি উপস্থাপন করছি। এতে হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, আমি আঁ হযরত (সা.)কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, ‘নামায পরিত্যাগ করাটা মানুষকে **শির্ক** (অংশীবাদিতা) ও **কুফর** (অস্বীকার)-এর নিকটবর্তী করে দেয়’। *[মুসলিম কিতাবুল ঈমান, বাব বয়ানুত্বালাক্ব ইসমুল কুফরি আ'লা মিন তরকিস্সালাত]*

আঁ হযরত (সা.) আরও বলেন, নামাযে আমার নয়ন জুড়ায়। হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সা.) বলেন, ‘কিয়ামত’-এর দিনে সবার আগে যে জিনিসের হিসাব বান্দার কাছ থেকে নেয়া হবে তা হলো নামায। এ হিসাব সঠিক থাকলে সে সফলতা লাভ করে পরিত্রাণ পেয়ে গেলো। আর এ হিসাব যদি নষ্ট হয়, ত্রুটিযুক্ত হয় তবে সে বিফল হয়ে ঘাটতিতে পড়ে রইলো। তার ফরযে

(অবশ্য আদায়যোগ্য নামাযে) কোন ঘাটতি থেকে গেলে আল্লাহ্ তাআলা বলবেন, 'দেখো! আমার বান্দার কিছু নফলও রয়েছে'। নফল থেকে থাকলে, ফরযের ঘাটতি সেই নফল দ্বারা পুরা করে দেয়া হবে।

একই ভাবে তার অন্যান্য আ'মল সমূহেরও পর্যালোচনা করা হবে আর সে সবের হিসাব-নিকাশও নিরীক্ষিত হবে। *[তিরমিযি, কিতাবুস্সালাত বাব ইন্না আওওয়ালা মাইইয়াহসেবু বিহিল আ'বদি]*

হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে–

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, আমি আঁ-হযরত (সা.)কে এ কথা বলতে শুনেছি : 'তোমরা কী ভাবতে পারো যে কারো দোরগোড়ায় যদি ঝরণা বয়ে চলে আর তাতে সে দিনে পাঁচ বার গোসল করে নেয় তবে তার দেহে কী ময়লা থেকে যাবে?' সাহাবাগণ (রাযি.) নিবেদন করলেন, 'হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)! কোন ময়লাই থাকবে না'। তিনি (সা.) বললেন, পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের উপমাও এইরূপ। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা পাপ মার্জনা করে থাকেন এবং দুর্বলতাসমূহ দূর করে দেন। [বুখারী, কিতাব মুয়াক্বিয়াতুস সালাত বাব আস সালাতুল খমসে কাফফারাতুল লিল খিত্বা']

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "নামায পড়ো! নামায নিয়মিত আদায় করো কারণ এটা হলো সামগ্রিক কল্যাণ ও সৌভাগ্যের চাবি"। [ইযালায়ে আওহাম, পৃষ্ঠা ৮২৯ প্রথম সংস্করণ}

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেন, "নামাযের মস্তিস্ক আর আত্মা উভয়ই হলো দোয়া।" [আইয়্যামুস্ সুলেহ, রূহানী খাযায়েন ১৪তম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৪১]

তিনি (আ.) আরও বলেন,

"ওহে লোক সকল! যারা নিজেদেরকে আমার জামা'তভুক্ত বলে গণ্য করে থাকো, তোমরা পুণরায় কেবল তখনই আমার জামা'তভুক্ত বলে পরিগণিত হবে যখন তোমরা সত্যিকারভাবে তাক্ওয়ার (খোদাভীতির) পথে অগ্রসর হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামায এরূপ ভীতির সাথে এবং নিবিষ্টচিত্তে আদায় করবে যে তোমরা যেন আল্লাহ্ তাআলাকে চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছো। নিজেদের রোযাও তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিষ্ঠার সাথে পালন করবে। যাকাত আদায়ের যোগ্যতাসম্পন্ন যারা তারা যাকাত দিবে। যাদের ওপর হজ্জ অবশ্যই পালনীয় আর তা পালনে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকলে তারা হজ্জ করবে –সমুদয় পূণ্যকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করবে এবং পাপকর্ম ঘৃণার সাথে বর্জন করবে। নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো! যাতে তাক্ওয়া নেই এমন কোন কর্ম আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। প্রত্যেক পুণ্য কর্মের মূল তাক্ওয়া। যেই কর্মে এ মূল অক্ষত থাকে, সেই কর্ম কখনও ধ্বংস হবে না"। [কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন ১৯তম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৫]

তিনি (আ.) আরও উল্লেখ করেছেন, "নামায কী? এটা হলো দোয়া, যা **তস্বীহ্** (মহিমাগীতি), তাহমীদ (প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন), **তাক্দিস** (পবিত্র ঘোষণা) এবং **ইস্তেগফার** (নিজ দুর্বলতা স্বীকর করে শক্তি প্রার্থনা করা) ও দরূদ (হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি আশিস কামনা করা)-সহ সবিনয় ও সকাতরে যাচনা করা হয়। অতএব, যখন তোমরা নামায আদায় করো তখন দোয়াতে অজ্ঞ লোকদের ন্যায় কেবলমাত্র আরবী শব্দ ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ থেকো না। কারণ তাদের নামায এবং ইস্তেগফার সবই বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপমাত্র যাতে কোন সারবস্তু নেই। কিন্তু তোমরা যখন নামায পড়ো তখন খোদা তাআলার কালাম কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণীতে বর্ণিত অন্যান্য কতিপয় প্রচলিত দোয়া ছাড়াও নিজেদের যাবতীয় সাধারণ দোয়া নিজ ভাষাতেই করো। এমনভাবে নিবেদন জানাও যাতে সকাতর সেই যাচনার সুপ্রভাব তোমাদের হৃদয়ে পতিত হয়। [কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন ১৯তম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৮-২৯]

অন্যত্র তিনি (আ.) আরও বলেন, নামায এমন প্রভাব বিস্তারী যে, এর দ্বারা উর্ধ্বালোক মানবের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। **'নামায'**-এর হক্ব আদায়কারী এমনটাই ভাবে যে, 'আমি মরে গেছি' আর তার আত্মা বিগলিত হয়ে খোদার আস্তানায় গড়াগড়ি খাচ্ছে.....যে গৃহে এমনতর নামায আদায় করা হবে, সে গৃহ কখনও ধ্বংস হবে না। হাদীস শরীফে রয়েছে, নূহ (আ.)-এর যুগে 'নামায' থাকলে সেই জাতি কখনও ধ্বংস হতো না। 'হজ্জ'-ও মানুষের ওপর শর্তভেদে পালনীয়, 'রোযা'-ও শর্তাধীনে ফরয আর 'যাকাত'-ও তাই, কিন্তু নামায আদায় ফরয হওয়াটা শর্তযুক্ত নয়। বর্ণিত অন্য সব ইবাদত এক বছরে একবার করে নির্ধারিত। তবে নামাযের ক্ষেত্রে প্রতিদিন পাঁচবার করে আদায় করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এজন্য যতক্ষণ পুরোপুরিভাবে নামায প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে ততক্ষণ সেই কল্যাণও লাভ হতে পারে না যা ওখেকে অর্জিত হওয়া নির্ধারিত আর ঐরূপ বয়আত করায় কোন মঙ্গলও লাভ হয় না। [মালফুযাত, ৩য় খন্ড, পৃ: ৬২৭]

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "নামায প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয অর্থাৎ অবধারিত রূপে পালনীয়। হাদীস শরীফে এসেছে, আঁ হযরত (সা.) এর কাছে ইসলাম গ্রহণকারী কতিপয় লোক এলো ও নিবেদন করলো, 'হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! আমাদেরকে নামায আদায় করার বাধ্য-বাধকতা থেকে রেহাই দেয়া হোক, কারণ আমরা ব্যবসায়ী মানুষ 'পশুর

পাল' কেনা-বেচা করে থাকি। গবাদি পশু ইত্যাদির বর্জ্যের জন্য আমাদের পরনের কাপড়-চোপড় পবিত্র থাকছে কি'না তার ভরসা রাখা যাচ্ছে না, তার ওপর আমাদের আবার সময়-সুযোগও হয়ে ওঠে না'। তিনি (সা.), এর প্রত্যুত্তরে তাদের বললেন–দেখো! নামায-ই যদি না থাকে তবে রইলোটা কী? 'নামায' না থাকলে সেটা 'ঈমান'-ই নয়। নামায কী? নিজেকে নি:স্ব করে দিয়ে নিজের দুর্বলতা ও অসহায়ত্বকে স্বীকার করে নিয়ে খোদা তাআলার সমীপে নিজেকে সঁপে দেয়া আর নিজের চাহিদা পূরণে তাঁরই দ্বারস্থ হওয়া। কখনও তাঁর বিশালত্বের সামনে তাঁর নির্দেশ প্রতিপালনার্থে সোজা-সরলভাবে দাঁড়িয়ে যাওয়া, আবার কখনওবা পরিপূর্ণভাবে বিনম্র বিলাজে সেজদাবনত হয়ে তাঁর সমীপে পড়ে থাকা। যাবতীয় চাওয়া-পাওয়া তাঁরই সমীপে নিবেদন করা, এই-ই হলো নামায এক ভিক্ষুক প্রার্থীর ন্যায় কখনও সেই দাতার বিশাল করুণা ও অপার মহীমার এমন প্রশংসা-গীতি করা যে–এতো এতো মহাম-হিমান্বিত তুমি।

মহাপরাক্রমশালী প্রবল প্রতাপান্বিত ক্ষমতাধর সত্তা তিঁনিই, তাঁরই সকাশে করুণা ভিক্ষা করতে থাকা। অতএব যে ধর্মে এটা (এমন নিবেদিত ইবাদত) নেই, তা আবার কেমন ধর্ম!

আবার যে ব্যক্তি নামায থেকে অব্যাহতি পেতে চায়, চতুষ্পদ জন্তর চেয়ে সে বেশী আর কি হলো? সে-ই পানাহার করা আর শুয়ে থাকা–এটা তো অবশ্যই ধর্ম নয়। এটা তো **'কাফির'** (অস্বীকারকারীর)-এর বৈশিষ্ট্য বরং নামায থেকে উদাসীনতার সেই মুহূর্ত, সেই ক্ষণ পুরোপুরি অস্বীকারেরই নামান্তর–একথাটি সুস্পষ্ট ও সঠিক"। [তফসীর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), ৩য় খন্ড, পৃ: ৬১১-৬১২, রাবওয়ায় মুদ্রিত, নব সংস্করণ]

নামাযে স্বাদ ও রুচি লাভের উপায় কী–এ প্রসঙ্গে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন –"হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে দেখছো যে আমি কেমন অন্ধ ও দৃষ্টিহীন আর আমি এখন পুরোপুরি মৃতাবস্থায় পতিত। আমি জানি যে স্বল্পকাল পরই আমার ডাক পড়লে আমি তোমার সকাশে এসে যাবো। সেকালে কেউ আমাকে আটকিয়ে রাখতে পারবে না। কিন্তু আমার অন্তরাত্মা দ্যুতিহীন অন্ধকারে ছেয়ে আছে। তুমি এমন জ্যোতির্ময় আলোক রশ্মি এর ওপর সম্পাতিত করো যেন তাতে তোমার অনুরাগপূর্ণ ভালবাসার উন্মেষ ঘটে। তুমি আমার ওপর করুণা বর্ষণ করো যেন আমি দৃষ্টিহীন অবস্থায় উত্থিত হয়ে অন্ধদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে পড়ি।

এ ধরনের দোয়া যাচনায় লেগে থেকে স্থায়িত্ব লাভ হলে পর দোয়াকারী তার নামাযে এমন এক মুহূর্তের আগমন প্রত্যক্ষ করবে যে স্বাদ ও রুচিহীন ওই নামাযে উর্ধ্বালোক থেকে এমন একটা কিছুর অবতরণ ঘটবে যা রুচিকর সুপ্রিয় সুমিষ্ট স্বাদ সৃষ্টি করে দেবে।" [মালফুযাত ২য় খন্ড, পৃ: ৬৬১, নব সংস্করণ]

তাহাজ্জুদ নামায নিয়মিত পড়ো

বয়আতের তৃতীয় শর্তে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার অঙ্গীকার করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ
رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

(সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত নং ৮০)

ওমা মিনাল লাইলে ফাতাহাজ্জাদবিহী নাফিলাতাল্লাক আ'সা আইইয়াব আ'ছাকা রাব্বুকা মাকামাম মাহমুদা অর্থাৎ সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে শুরু করে রাতের আধার ঘনিয়ে আসা পর্যন্ত নামায প্রতিষ্ঠিত করো আর ফজরের সময় তিলাওয়াত করাকে গুরুত্ব প্রদান করো। ফজরে কুরআন পাঠ নিশ্চয়ই এমন যে তা সাক্ষ্য প্রদান করে থাকে, আর নিশুতিকালের এক অংশেও তার (কুরআন পাঠের) সাথে তাহাজ্জুদ (নামায) পড়তে থাকো। এটা তোমাদের জন্য হবে নফল বিশেষ। শীঘ্রই তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক তোমাদেরকে **'মাক্বামে মাহমুদ'**-এ অধিষ্ঠিত করে দেবেন।

হযরত বেলাল (রাযি.) বর্ণনা করেছেন যে আঁ হযরত (সা.) বলেছেন,তাহাজ্জুদ নামায তোমাদের নিয়মিত ভাবে পড়া উচিত, কেননা এটা অতীতকালের সৎকর্মশীলদের পদ্ধতি ছিল এবং স্রষ্টার নৈকট্য লাভের মাধ্যম এটা। এই অভ্যাস পাপকর্ম থেকে বিরত রাখে, মন্দকর্ম দূর করে আর শারীরিক রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা করে। [তিরমিযি, আবওয়াবুদ্ দাওয়াত]

এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন–রাতের শেষ প্রহর যখন আসে আল্লাহ্ তাআলা তখন পৃথিবী সকাশে অবতরণ করেন আর বলেন, আছে কী কেউ? যে আমার কাছে দোয়া (যাচনা) করবে আর আমি তার দোয়া কবুল করবো। কেউ কী আছে? যে আমার কাছে রিযিক প্রার্থনা করবে আর আমি তাকে রিযিক দান করব। কেউ কি আছে? যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর আমি তাকে মার্জনা করবো। কেউ কী আছে? যে তার নিজের দু:খ ক্লেশ দূর করার জন্য দোয়া করলে আমি তার দু:খ ক্লেশ বিদূরিত করবো। এভাবে আল্লাহ্ তাআলার এই আহ্বান করা চলতেই থাকে এমনকি **সুবেহ সাদেক**-প্রভাতের আলোক রেখা ফুটে ওঠে। [মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, পৃ. ৫২১, বৈরুতে মুদ্রিত]

অনেকেই দোয়ার জন্য লিখে থাকেন। তারা নিজেরাও এ পদ্ধতির ওপর আমল

করে আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহের বারিবর্ষণ হওয়া দেখুন।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা বলেন–যে আমার বন্ধুর সাথে শত্রুতা করেছে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করছি। আমার বান্দা, যতটা আমার নৈকট্য, যা কিছু আমার পসন্দ আর আমি (যেসব) তাদের জন্য ফরয করে দিয়েছি, তা থেকে লাভ করতে সক্ষম হবে, ততটা অন্য আর কিছু থেকে লাভ করতে পারবে না। আর নফলের মাধ্যমে আমার বান্দা আমার এমন নিকটতর হয়ে যায় যে আমি তাকে ভালবাসতে শুরু করে দিই। আর আমি তাকে যখন নিজের বন্ধু বানিয়ে নিই তখন তার কান হয়ে যাই যদ্বারা সে শুনে, চোখ বনে যাই যাই যদ্বারা সে দেখে, তার হাতে পরিণত হই যদ্বারা সে ধরে রাখে, তার পা হয়ে যাই যদ্বারা সে চলা-ফেরা করে, অর্থাৎ আমি-ই তার রূপকার-নির্মাতা। আমার কাছে চাইলেই আমি তাকে দিই, সে আমার কাছে আশ্রয় যাচনা করলে আমি তাঁকে নিরাপদ আশ্রয় দান করি। [বুখারী, কিতাবুর রক্বাক্ব বাব আত্ তওয়াযা']

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) আরও বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেন, সেই ব্যক্তির ওপরও আল্লাহ্ তাআলা রহম করুন, যে রাতের বেলায় জেগে ওঠে ও নামায পড়ে আর প্রিয়তমা স্ত্রীকে জাগিয়ে দেয়। স্ত্রী জেগে ওঠতে গরিমসি করলে তার মুখমন্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয় যাতে সজাগ হয়ে সে ওঠে পড়ে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তাআলা সেই স্ত্রীর প্রতিও রহম করুন, যে রাতকালে জেগে ওঠে, নামায পড়ে আর প্রিয়তম স্বামীকেও জাগিয়ে তুলে। স্বামী জেগে ওঠতে গড়িমসি করলে তার মুখমন্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয় যাতে সে জেগে ওঠে। [আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত]

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন–"তাহাজ্জুদের নামাযকে আমাদের জামা'ত-এর অবশ্য পালনীয় রূপে গ্রহণ করে নেয়া উচিত। যারা বেশী পারে না তারা না হয় দু'রাকাত-ই পড়ে নিক, কেননা এতে তাদের অন্তত: দোয়া করবার সুযোগ তো লাভ হবে। সেই সময়ের দোয়াতে এক বিশেষ প্রভাব থাকে কারণ প্রকৃতই তখন মায়া-মমতা ও আবেগের সাথে তা উৎসারিত হয়।

যতক্ষণ কারো অন্তরে এক বিশেষ আবেগ ও মর্মবেদনা অনুভূত না হচ্ছে ততক্ষণ তার কায়-ক্লেশ কী করে কেটে উঠতে পারে? অতএব, সেই সময়ে জেগে ওঠাটাই এক মর্মবেদনা সৃষ্টি করে দেয় যা দোয়াতে বিনম্র কোমলতা ও উদ্বেগপূর্ণ আকুলতা সৃষ্টি করে আর এই উদ্বেগাকুল অস্থিরতা দোয়া গ্রহণীয় হওয়ার কারণে পরিণত হয়। কিন্তু জেগে ওঠায় যদি দুর্বলতা ও উদাসীনতা দেখা যায় তবে তো এটাই প্রকাশ পায় যে হৃদয়ে সেই মর্ম-যাতনা নেই কেননা ঘুম ও নিদ্রা তো মর্ম-বেদনা লাঘব করে দেয়। কিন্তু ঘুমহীন রাত যখন কাটে তখন বুঝা যায় যে মর্মপীড়ার কষ্টকর কোন যাতনা নিদ্রার চেয়েও শক্তিশালী হয়ে চেপে রয়েছে যা ঘুম থেকে জাগিয়ে রাখছে"। [মালফুযাত, ২য় খন্ড, পৃ. ১৮২ নব সংস্করণ]

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেছেন –

"রাতে জেগে ওঠো! আর যাচনা করো যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে তাঁর হেদায়াতের পথ দেখান। আঁ হযরত (সা.) এর সাহাবাগণও পর্যায়ক্রমে তরবীয়ত (প্রশিক্ষণ) লাভ করেছেন। পূর্বে কী ছিল তারা! এক কৃষকের ন্যায় আঁ হযরত (সা.) চাষের জমিতে বীজ বপন করা আর জমিতে পানি দেয়ার ন্যায় তাতে সেচ প্রদান করলেন–তিনি (সা.) তাদের জন্য সকাতরে দোয়া করলেন। বীজ ছিল অঙ্কুরোদগমী আর জমিও ছিল উর্বরা। তাই সেই পানি সিঞ্চনে ফলও ফললো সব বাহারী রকমের। হুযূর (সা.) যে পথে চলতেন তারাও সে পথ ধরেই চলতো, দিন বা রাতের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তারা করতো না। বিশুদ্ধ অন্তরে তোমরা তওবা (প্রত্যাবর্তন) করো, তাহাজ্জুদে ওঠো, দোয়া করো, সঠিকভাবে মনোনিবেশ করো, দুর্বলতা পরিহার করো আর খোদা তাআলা সন্তুষ্ট হোন তদনুযায়ী কথায় ও কাজে নিজেদের সুসজ্জিত করো। [মালফুযাত, প্রথম খন্ড, পৃ. ২৮ নব-সংস্করণ]

আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর প্রতি 'দরূদ প্রেরণ করা'-কে স্থায়ী অবলম্বন করে নাও

বয়আতের এই তৃতীয় শর্তে আরও রয়েছে যে আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করবো, দরূদ পাঠে নিয়োজিত থাকবো আর এই দরূদ পাঠকে নিয়মিত অবলম্বন রূপে গ্রহণ করে নেবো। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন করীমে আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

(সূরা আল আহযাব আয়াত নং ৫৭)

ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আ'লান্নাবীয়ে ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশ্তারা এই নবীর ওপর রহমত বর্ষণ করেন। হে লোক সকল! যারা ঈমন এনেছো তোমরাও তার ওপর দরূদ আর সালাম বেশী-বেশী করে প্রেরণ করো।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর ইবনুল আস (রাযি.) থেকে বর্ণনা রয়েছে, তিনি হযরত নবী করীম (সা.)-কে বলতে

শুনেছেন–যখন তোমরা মুয়ায্যিনকে আযান দিতে শুনবে তখন তার উচ্চারিত ঐ বাক্যাবলী পুনরাবৃত্ত করো যা আযানে সে বলে, অত:পর যে ব্যক্তি আমার প্রতি দুরূদ পাঠ করে আল্লাহ্ তাআলা দশগুণ পুণ্য তার ওপর অবতীর্ণ করবেন। তিনি (সা.) আরও বলেছেন– আল্লাহ্ তাআলার সকাশে আমার জন্য কল্যাণ যাচনা করো যা জান্নাতের মর্যাদাপূর্ণ স্তরসমূহের মধ্যে এক মর্যাদাকর অবস্থান। আল্লাহ্ তাআলার বান্দাদের মধ্য থেকে কোন একজন যে এটা লাভ করতে সক্ষম হবে, আমি প্রত্যাশা রাখি যে আমি-ই হবো সেই ব্যক্তি, আর সেই একজন যে আমার জন্য আল্লাহ্ তাআলার সমীপে কল্যাণ যাচনা করেছে তার শাফাআ'ত লাভ করাটা বৈধতা পেয়ে যাবে। [সহী মুসলিম, কিতাবুস সালাত, বাব আল ক্বওলু মিসাল ক্বওলু মুয়াজ্জিন লামিনাশ সামাআহু সুম্মা ইউসাল্লি আলান্নাবীয়ে (সা.)]

অতএব, এই সবগুলো আঙ্গিক দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি পাবার জন্য, খোদা পর্যন্ত পৌঁছুতে, নিজের দোয়াকে আল্লাহ্ তাআলার সমীপে কবুলিয়্যতের (গ্রহণীয়তার) দুয়ার আন্দোলিত করতে আবশ্যকীয় হলো আঁ হযরত (সা.) এর মাধ্যম-মধ্যস্ততা। যেমনটি হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে আর হযরত মসীহ মাওউদ (আ:)-ও বলেছেন এটাই যে, অনেক বেশি সংখ্যায় দরূদ পাঠ করা উচিত।

আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিও ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আ'লা ইব্রহিমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদদিও ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাক তা আ'লা আলি ইব্রহিমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহিমা ইন্না কা হামিদুম মাজিদ।

হযরত আমর বিন রাবিআ' (রাযি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন–যেই মুসলমান আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমার প্রতি দরূদ পাঠে রত থাকে ততক্ষণ নাগাদ ফিরিশ্তারা তার ওপর আশিস বর্ষণ করে চলে। সেই দরূদ পাঠকারী তার ইচ্ছে মাফিক তা যত স্বল্পকালীন সময়ের জন্যই করুক বা যত বেশী সময় ধরেই করুক।

হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাযি.) বর্ণনা করেন, দোয়া আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ঝুলে যায় আর যতক্ষণ তুমি তোমার আপনজন মহানবী (সা.)-এর ওপর দরূদ প্রেরণ না করো ওখেকে কোন অংশই (খোদা তাআলার সকাশে উপস্থাপিত হওয়ার জন্য) উর্ধ্বালোকে উন্নীত হয় না। [তিরিমিযি, কিতাবুস সালাত, বাব-মা জাআ' ফি ফাসলুস সালাত আ'লান্নাবীয়ে (সা.)]

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন– কিয়ামত দিবসে লোকদের মধ্য থেকে সেই ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে, তাদের মধ্যে যে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশী দরূদ প্রেরণকারী ছিল। [প্রাগুক্ত হাদীস গ্রন্থ]

হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) দরূদ শরীফের কল্যাণরাজি সম্পর্কে নিজস্ব অভিজ্ঞান প্রসঙ্গে এক বর্ণনায় নিম্নোক্ত বাক্যাবলী উপস্থাপন করেছেন। তিনি (আ.) বলেন–"একবার দরূদ শরীফ পাঠের এমন সুযোগ হলো যে আঁ হযরত (সা.) এর প্রতি দরূদ প্রেরণে এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমি মুহ্যমান হয়ে রইলাম, কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে খোদা তাআলার নৈকট্যের রাস্তা অতীব সূক্ষ্ম যা নবী করীম (সা.)-এর মধ্যবর্তীতা ব্যতিরেকে লাভ করা যায় না। আল্লাহ্ তাআলাও তেমনটা নির্দেশ করেছেন–**ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা**.....(আল মায়েদা : ৩৬) [অর্থাৎ তাঁর নৈকট্য লাভের মাধ্যম অবলম্বন করো]

একটা সময় অতিক্রান্ত হবার পর **'কাশফ'** দিব্য-দর্শন রত অবস্থায় আমি দেখলাম আমার ঘরে দুইজন পানি পরিবেশনকারী প্রবেশ করলো, একজন অন্দর মহলের প্রবেশ পথ ধরে অপরজন বহির্মহল থেকে প্রবেশ হবার পথ দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো আর তাদের কাঁধে ছিল **'নূরের মশক'**, তারা মুখে বলে চলছিল **হাযা বিমা সাল্লাইতা আ'লা মুহাম্মাদীন।"** [হাকীকাতুল ওহী, টীকা, পৃ: ১২৮, রূহানী খাযায়েন ২২তম খন্ড, পৃ. ১৩১ এর টীকা]

অর্থাৎ এইসব কল্যাণ সেই 'দরূদ শরীফ' এর কারণে যা তুমি মুহাম্মদ (সা.)-এর উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেন–"দরূদ শরীফের বদৌলতে..আমি প্রত্যক্ষ করেছি যে আল্লাহ্ তাআলার কল্যাণরাজি অনুপম নান্দনিক এক জ্যোতিরূপে আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি সম্পাতিত হচ্ছে আর সেখানে পৌঁছে আঁ হযরত (সা.)-এর বক্ষে শোষিত হয়ে যাচ্ছে। অত:পর সেখান থেকে অসংখ্য আলোক রশ্মিপথে তা নির্গত হয়ে প্রত্যেক হক্দারের কাছে তার ন্যায্য অংশ পৌঁছে যাচ্ছে। নিশ্চিত যে আঁ হযরত (সা.)-এর মধ্যবর্তীতা ছাড়া কোন কল্যাণ কারও নিকট পৌঁছুতেই পারে না। দরূদ শরীফ কী? রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মর্যাদাপূর্ণ সেই জ্যোতির্ময়তায় গতি সঞ্চার করা যাতে অসংখ্য আলোকরশ্মিতে উজ্জ্বল পথ বেয়ে আলোর সেই ফল্গুধারা ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তাআলার আশিস ও কল্যাণ প্রত্যাশী যারা, তাদের জন্য অবশ্য করণীয় যে, অনেক-অনেক বেশী সংখ্যায় তারা দরূদ শরীফ পাঠে মনোনিবেশ করুন যাতে কল্যাণ প্রদায়ী সেই উৎস উদ্বেল হয়ে ওঠে"। [আল হাকাম, ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩, পৃ.-৭]

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রসঙ্গত আরও বলেছেন–মানুষ তো প্রকৃতপক্ষে বান্দা অর্থাৎ চাকর। 'চাকর' -এর কাজ এই-ই হয়ে থাকে যে মনিব যে নির্দেশ দেয়, হুবহু তাই সে পালন করে। অনুরূপভাবে, আঁ হযরত (সা.)-এর আশিস পেতে চাইলে তোমাদের জন্য আবশ্যকীয় যে তাঁর (সা.) অনুগত দাস হয়ে যাও। কুরআন করীমে আল্লাহ্

তাআলা বলেন–

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ

(আল যুমার, ৩৯ : ৫৪)

কুল ইয়াই'বাদিয়াল্লাযিনা আসরাফু আ'লা আনফুসিহিম এখানে **'বান্দা'** বলে আখ্যায়িত করার উদ্দেশ্য 'চাকর'-ই। সাধারণ অর্থে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট অপরাপর কোন প্রাণী নয়। রাসূল করীম (সা.)-এর বান্দা বা চাকর রূপে নিবেদিত হতে যা জরুরী তা হলো তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ পাঠ করা আর তাঁর (সা.) কোন এক নির্দেশেরও অমান্য না করা আর সমস্ত আদেশ-নির্দেশের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা।" [বদর পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, ১৪তম সংখ্যা, ২৪ এপ্রিল ১৯০৩ পৃ. ১০৯]

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) অপর একস্থানে বলেন,................

"আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আ'লাইহি ওয়া আলিহি বি আ'দাদি হাম্মিহি ওয়া গাম্মিহি ওয়া হুযনিহী লি হাযিহিল উম্মাতি ওয়া আনযিল আ'লাইহি আনওয়ারা রাহমাতিকা ইলাল আবদি"

অর্থাৎ–হে আল্লাহ্! দরূদ ও সালাম আর কল্যাণরাজি প্রেরণ করো তাঁর (সা.) প্রতি সেই সাথে তাঁর (সা.) অনুসারীদের প্রতি। এতোটাই অধিক পরিমাণে কৃপা ও আশিস তাঁকে (সা.) দান করো যত বেশী পরিমাণে তাঁর (সা.) হৃদয় উদ্বেগাকুল থাকতো এই উম্মতের জন্য, আরও তাঁর (সা.) প্রতি তোমার নিজস্ব রহমতের নূর সর্বক্ষণ অবতীর্ণ করতেই থাকো। [বারাকাতুদ দোয়া, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ.-১১]

প্রতি নিয়ত ইস্তেগফার করায় রত থাকো–

এই তৃতীয় শর্তে **'ইস্তেগফার'**-এর বিষয়ও উল্লেখিত হয়েছে। পবিত্র কুরআন করীমে আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ﴿۱۱﴾

يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿۱۲﴾

وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ

وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ﴿۱۳﴾

(সূরা নূহ, ১১-১৩)

ফাকুলতুসতাগফিরু রাব্বাকুম- ইন্নাহু কানা গাফফারান-আইইউরসি লিস্ সামাআ আ'লাইকুম মিদারারান- ওয়া ইয়ুম দিদকুম বি আমাওয়ালিও ওয়াবানিনা ওয়া ইয়াজ আল্ লাকুম জান্নাতিঁও ওয়া ইয়াজআল্ লাকুম আনহার

অতএব, আমি বললাম, নিজ প্রভু-প্রতিপালকের সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাকারী। তিনি তোমাদের প্রতি অবিরাম বর্ষণকারী মেঘমালা পাঠাবেন, সেই সাথে তিনি ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দ্বারা তোমাদের সমৃদ্ধশালী করবেন, আরও দিবেন বিভিন্ন বাগানসমূহ আর বইয়ে দিবেন নদী ও ঝর্ণাধারা।

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ﴿۴﴾

(১১০ আন নসর : ৪)

ফাসাব্বিহ্ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াসতাগফিরহু ইন্নাহু কানা তাওওয়াবা

অতএব নিজ প্রভু-প্রতিপালকের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার সাথে তাঁর মহিমাগীতি করো আর সেই সাথে নিজ দুর্বলতা স্বীকার করে তার সমীপে শক্তি প্রার্থনা করে ক্ষমা ভিক্ষা করো। নিশ্চয় তিনি অত্যধিক তওবা কবুলকারী।

এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস রয়েছে। আবু বরদাহ বিন আবু মূসা (রাযি.) তার পিতা আবু মূসা (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন–আল্লাহ্ তাআলা আমার প্রতি আমার উম্মতকে দু'টি আমানত পৌঁছানোর ব্যাপারে ওহী নাযিল করেছেন। যা হলো–

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ۚ وَمَا كَانَ

اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿۳۴﴾

(৮ আল আনফাল : ৩৪)

(২য় পৃঃ পর কুরআনের ব্যাখ্যার অবশিষ্টাংশ)

লোকেরা না জানি কোন অনিষ্ট করে বসে এবং মেহমানদের উপস্থিতিতে তাঁর অমর্যাদা করে। কোন বিশেষ অনিষ্টের কথা এখানে নির্দেশ করেননি। হযরত লুত (আ.)-এর জাতি দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিল, স্বভাবিক কারণেই তিনি শঙ্কিত হয়েছিলেন যে তারা কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করতে পারে। এমতাবস্থায় তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা যদি সন্দেহ করে থাক যে, আমি অপরিচিত লোকদের সহায়তায় তোমাদের বিরুদ্ধে ক্ষতিকর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তবে তোমরা আমার কন্যাদেরকে শাস্তি দিয়ে আমার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবে, এই অবস্থা অবলম্বন তোমাদের জন্য উত্তম হবে, এবং এভাবে তোমরা আমার মেহমানদের অপমান করার মত লজ্জাজনক কর্ম পরিত্যাগ করতে পারবে। অথবা এটাও হতে পারে যে, হযরত লূত (আ.) শহরের শ্রদ্ধাষ্পদ বৃদ্ধ ব্যক্তি হওয়ার কারণে তিনি তাদের স্ত্রীদেরকে নিজের কন্যারূপে আখ্যায়িত করে বললেন : তারা তোমাদের জন্য পবিত্র।

ওয়ামা কানাল্লাহু লিইউআযিযবাহুম ওয়া আনতা ফিহিম ওয়া মা কানাল্লাহু মুআযিযবাহুম ওয়া হুম ইয়াসতাগফিরুন–

অর্থাৎ আল্লাহ্ এমন নন যে, তাদেরকে শাস্তি দিবেন যতক্ষণ তুমি তাদের মাঝে বিদ্যমান রয়েছো, আর আল্লাহ্ এমনও নন যে তাদের শাস্তি দিয়ে দিবেন যখন তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে চলছে। অতএব, আমি যখন তাদের ছেড়ে যাবো তখন কিয়ামত দিবস নাগাদ ইস্তেগফারকে তাদের সাথী করে দিয়ে যাবো। *[জামে' তিরমিযি, কিতাব তফসীরুল কুরআন, তফসীর সূরাতুল আনফাল]* (চলবে)

ভাষান্তর : **মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্**

ইসলাম প্রচার প্রসার ও বিস্তারে আহমদীয়াত

ইন্দোনেশিয়া

১৯২৪ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ইউরোপ সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ইন্দোনেশিয়ার কতক আহমদী হুযূর (রা.)-এর কাছে এই মর্মে আবেদন করেন যে, হুযূর (রা.) পশ্চিমা দেশসমূহে সফর করেছেন এখন পূর্বের দেশসমূহেও আগমন করুন। এর জবাবে হুযূর (রা.)–বলেন, "ইনশাআল্লাহ্ আমি অথবা আমার কোন প্রতিনিধি আপনাদের দেশ সফরে যাবে।" হুযূর (রা.) মৌলভী রহমত আলী সাহেবকে ইন্দোনেশিয়া পাঠান। তিনি ১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সেখানে পৌঁছেন। দ্রুত সেখানে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩১ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী তারিখে জামা'তে আহমদীয়ার মিশন জাভায় কার্যক্রম শুরু করে। আল্লাহ্র অস্তিত্ব এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার ওপর তাঁর এত দৃঢ় ঈমান ছিল যে, একবার তাঁর বসবাস স্থল Padang শহরের কাঠ দিয়ে বানানো ঘরবাড়িতে আগুন লেগে তা ছড়িয়ে পড়ে। আশেপাশের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেখতে দেখতে তাঁর নিকটস্থ ঘরে আগুন পৌঁছে যায়। সবাই তাঁকে ঘর হতে বের হতে বলছিল। কিন্তু তিনি বললেন, এই ঘরে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এক গোলাম নগন্য এক সেবক বাস করে। হুযূর (আ.)কে আল্লাহ্ তাআলা ইলহাম করেছিলেন, **"আগুন আমাদের গোলাম অধিকন্তু আমাদের গোলামদেরও গোলাম।"** এ আগুন যেখান পর্যন্ত এসেছে সেখানেই থেমে যাবে, তিনি ঐ কথা বলতে বলতেই আকাশ মেঘে ছেয়ে যায় এবং মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। আর আগুন সম্পূর্ণভাবে নিভে যায়। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) ২০০০ সালের ৪ জুলাই তারিখে এই ঘরটি দেখতে আসেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে আবেগপূর্ণ দোয়া করেন। ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে Batawia-তে প্রথম মসজিদ "আল হেদায়াত" নির্মিত হয়।

১৯৪৫ সালের ১৭ আগষ্ট তারিখে ডা. সুকর্ণ ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। আহমদী মোবাল্লেগগণ স্বাধীনতা ঘোষণার স্বপক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। সৈয়দ শাহ সাহেব মোবাল্লেগ সিলসিলাহ এই আহ্বানে এত আবেগের সাথে অংশগ্রহণ করেন যে, ১৯৪৯ সালে ডা. সুকর্ণ ডাচ সরকারের কাছ থেকে চার্জ গ্রহণের জন্য যে ১৪ জন বিশিষ্ট প্রতিনিধিসহ রাজধানীতে পৌঁছান তাদের মধ্যে সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ সাহেব অন্যতম। ইন্দোনেশিয়ায় তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়। ইন্দোনেশীয় সরকার তাঁকে "স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার মহান মুক্তিযোদ্ধা" উপাধিতে ভূষিত করেন। ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি জনাব সুহার্ত তাঁকে ইন্দোনেশিয়া নাগরিকত্ব প্রদান করেন। ইন্দোনেশিয়া জামা'ত, ১৯৫৩ সালের ১৪ আগষ্ট কুরআন মজীদের ডাচ অনুবাদ রাষ্ট্রপতি সুকর্ণকে প্রদান করে। এবং পুণরায় তাঁকে ১৯৫৫ সালের ৬ জুন তারিখে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)–এর তফসীরের ইংরেজী অনুবাদ প্রদান করে। ১৯৫৪ সালে মৌলভী মোহাম্মদ সাদেক সুমাত্রী MALAY ভাষায় কুরআন মজীদের অনুবাদ করেন। ইন্দেনেশিয়া জামা'তের নায়েব আমীর রাজন হেদায়েত সাহেব জামা'তের কেন্দ্র রাবওয়ায় তিন মাসাধিককাল অবস্থান করে দেশে ফেরার সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর কাছে ইন্দোনেশিয়া জামা'তের জন্য তবারক চাইলে হুযূর (রা.) তাঁকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর স্বহস্তে লিখিত "হাকীকাতুল ওহী" পুস্তকের পাণ্ডুলিপির আট পৃষ্ঠা তবারক হিসেবে ইন্দোনেশিয়া জামা'তকে প্রদান করেন এবং ইন্দোনেশিয়া জামা'তকে উদ্দেশ্য করে লেখা পত্রে লিখেন, *"আহমদীয়াতের প্রতি আপনাদের নিষ্ঠা এবং ভালবাসা দেখে আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই তবারক পাঠাচ্ছি।"*

১৯৫৮ সালে মালিক আযিয আহমদ খান সাহেব ইন্দোনেশিয়ান ভাষায় কুরআন মজীদের অনুবাদ সম্পন্ন করেন। খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ২০০০ সালে ইন্দোনেশিয়া সফর করেন। কোন খলীফার এটাই প্রথম ইন্দোনেশিয়া সফর। ২০০৬ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ খামেস (আই.) দূরপ্রাচ্য সফর করেন, তবে তাঁর ইন্দোনেশিয়া যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে ২০০৬ সালের ৮ এপ্রিল সিঙ্গাপুরে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় আমেলার সভায় হুযূর (আই.) বলেন, ইনশাআল্লাহ্ ইন্দোনেশিয়ায় ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। জামা'তের সদস্যদের প্রশিক্ষিত করুন, যাতে তাঁরা পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষা দিতে পারে।"

শ্রীলঙ্কা

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগেই প্রচারপত্রের মাধ্যমে শ্রীলংকায় আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছায়। ১৯১০ সালের জানুয়ারী মাসে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বহি:র্বিশ্বে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছানোর জন্য আহ্বান জানান এবং এ বিষয়ে সিঙ্গাপুর ও শ্রীলংকায় প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যা দ্বিতীয় খলীফার যুগে পূর্ণতা লাভ করে। ১৯১৫ সালের ১৪ মার্চ হযরত সুফী গোলাম মোহাম্মদ সাহেবকে মরিশাসের পথে শ্রীলংকার কলম্বো পৌঁছান। তিনি

সেখানে তিন মাস অবস্থানের পর মরিশাস চলে যান। এরপর সেখানে মৌলভী ইব্রাহিম মালাবাড়ী সাহেব সেখানে মোবাল্লেগ নিযুক্ত হন। ১৯১৬ সালে শ্রীলংকা মিশনের পক্ষ থেকে সাপ্তাহিক "The Message" প্রকাশিত হওয়া শুরু করে। এ বছরই জামা'তের প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তামিল ভাষায় "মাসিক দোতান" প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯২৭ সালের ১০ অক্টোবর হযরত মুফতি মোহাম্মদ সাহেব শ্রীলংকা আসেন এবং তিনি সেখানে বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি সেখানে বিভিন্ন বিতর্ক অনুষ্ঠানেও যোগদান করেন। জামা'ত প্রতিষ্ঠার ১৬ বছর পর ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলম্বোতে সাংগঠনিকভাবে দারুত তবলীগ (প্রচার কেন্দ্র) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫১ সালে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তাঁর এক স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেন, "আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার সামনে কোন একটি বিষয় রাখা হয়েছে যাতে বলা হয়েছে আমাদের প্রচার পত্র সিংহলীজ ভাষায় প্রকাশ হওয়া শুরু হয়েছে এবং এর শুভ পরিণতি হবে। স্বপ্নে আমি বলছি সিংহলীজ ভাষাতো আছে কিন্তু সিনহলীজ কেন লেখা হয়েছে। আমি আবার চিন্তা করলাম সিনহলীজ আবার কোনটি? এরপর আমার চিন্তা আবার এ দিকে গেলো যে, হয়তো বা এটি মালে ভাষার কোন একটি সংস্করণ"

এই প্রতাপপূর্ণ স্বপ্ন প্রকাশের ৫ বছর পর ১৯৫৭ সালে সিনহলীজ ভাষায় "ইসলামী নীতিদর্শন" এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। (তারিখে আহমদীয়াত, ৫ম খন্ড, ২৯৭ পৃষ্ঠা)

সিঙ্গাপুর

১৯৩৫ সালের ৬ মে তারিখে তাহরীকে জাদীদের অধীনে বহির্বিশ্বে প্রেরিত প্রথম প্রতিনিধি দলের মৌলভী গোলাম হোসেন আয়ায সাহেব সিঙ্গাপুর গমন করেন। বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে তিনি অনেক বিরোধীতার সম্মুখীন হন। একবার তাঁকে এমনভাবে প্রহার করা হয় যে, তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) মাওলানা গোলাম হোসেন আয়ায সাহেবের এসব অত্যাচারের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "এমন সব এলাকাতেও আহমদীয়াত প্রসার হতে শুরু করেছে, যেখানে ইতোপূর্বে চেষ্টা করেও আমরা সফল হইনি। মালায়াতে এমন অবস্থা হয় যে মৌলভী হোসেন সাহেবকে লোকেরা মারতে মারতে রাস্তায় ফেলে দেয়। এবং তাঁকে কুকুর চাটতে থাকে অথবা এখন যারা মালায় থেকে ফেরত আসছে, তাদের বর্ণনা মতে সংগতিসম্পন্ন বড় বড় হোটেলের মালিকরা এবং সমাজের বিশেষ ব্যক্তিরা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে এবং এই জামা'ত প্রতিদিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে।" (তারিখে আহমদীয়াত ৮ম খন্ড, ২১১-২১২ পৃষ্ঠা)

হযরত মাওলানা গোলাম হোসেন আয়ায সাহেব ১৯৪৭ সালে মসজিদ মিশন হাউজের জন্য ১৯১৩৭ বর্গফুটের একখন্ড জমি ক্রয় করেন যাতে কাষ্ঠনির্মিত একটি বাসগৃহও ছিল। যা ১৯৮৩ সন পর্যন্ত মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মৌলভী সাহেব লোকদেরকে বলেন, গোলাগুলির সময় আমার ঘরে চলে আসবেন। আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে আশেপাশের ঘরবাড়িগুলোতে আঘাত এসেছে ঠিকই কিন্তু তাঁর ঘর অক্ষত ছিল। এভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী "আগুন আমাদের দাস বরং আমাদের দাসদেরও দাস" বার বার পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। (বার্ষিক আলফযল, ১৮ ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ: ১৭)

মওলানা আয়ায সাহেব ১৫ বছরব্যাপী সিঙ্গাপুরে ইসলাম প্রচার করেন। তিনি কিছুদিনের জন্য কেন্দ্রে আসেন এরপর আবার তাঁকে বোর্ণিও পাঠানো হয়। সেখানে ১৯৫৯ সনের ১৭/১৮ অক্টোবর এর মধ্য রাতে তিনি সেখানেই ইন্তেকাল করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৯৮৩ সালে সিঙ্গাপুর সফরের সময় "মসজিদে ত্বাহা" এর ভিত্তিপ্রস্তর রাখেন যা ২ বছরের মধ্যে নির্মিত হয়। ২০০৬ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ খামেস (আই.) সিংগাপুর সফরকালীন সময়ে (৫-১০ এপ্রিল ২০০৬) ৭ এপ্রিল ২০০৬ তারিখে একই জায়গায় মিশন হাউজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। হুযূর (আই.) সিংগাপুরের ন্যাশনাল মজলিসে আমেলাকে দিক নির্দেশনা দান করে বলেন, ".....আপনাদের অনেক সুযোগ আছে, ছোট রাষ্ট্র, সবার সাথে যোগাযোগ করাও সহজ। চেষ্টা করলে আপনারা অন্য জামা'তের জন্য দৃষ্টান্ত হতে পারেন।" (বার্ষিক আল ফযল, ১৮ ডিসেম্বর, ২০০৬ পৃ: ২৬)

অষ্ট্রেলিয়া :

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশাতেই অষ্ট্রেলিয়ায় আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছে। ১৯০৩ সনে একজন আফগানিস্তানের সুফী হোসেইন মুসা খান পত্রের মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বয়আত করেন। কিন্তু ডা. ইজাজুল হক সাহেব অষ্ট্রেলিয়ায় গেলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ১৯৮০ সনে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮১ সালে ডাক্তার সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর কাছে সিডনী শহরে মসজিদ নির্মাণের জন্য তহবিল সংগ্রহের অনুমতি চাইলে হুযূর (রাহে.) তা মঞ্জুর করেন। ১৯৮৩ সালে ২৭ একর জমি মসজিদের জন্য ক্রয় করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৯৮০ সনের ৩০ সেপ্টেম্বর জুমুআর দিন সিডনী শহরের

"বায়তুল হুদা" মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। হুযূর (রাহে.) বলেন, "আজ আমরা অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে প্রথম আহমদীয়া মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের জন্য একত্রিত হয়েছি। আজকের দিনটি জামা'তের ইতিহাসে একটি মাইলফলক।......নি:সন্দেহে এই দিন অষ্ট্রেলিয়ার ইতিহাসেও একটি নতুন মাইলফলক সংযোজন করছে।......এটি প্রথম ইট যা আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতের উদ্দেশ্যে নির্মিতব্য এ ঘরের ভিত্তিস্বরূপ রাখা হয়েছে। কিন্তু এটি শেষ ইট নয়। কেননা তাহলে এই মসজিদটি শেষ মসজিদ হয়ে যাবে।" (বার্ষিক আল ফযল, ডিসেম্বর ২০০৬, ৩৩ পৃষ্ঠা)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সবুজ পাগড়ীওয়ালা সাহাবী হযরত মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন সাহেব হুযূর (রাহে.)-এর সাথে ভিত্তি প্রস্তরে একটি ইট রাখেন। ১৯৮৫ সালের ২৫ জুলাই মওলানা শাকিল আহমদ সাহেব মুনির মোবাল্লেগ হিসেবে অষ্ট্রেলিয়ায় গমন করেন। এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৯৮৯ সালের ১৪ জুলাই জুমুআ এবং ঈদুল আযহিয়ার দিন সিডনিতে "বায়তুল হুদা"য় ঈদের নামায পড়ান ও খুৎবা প্রদান করেন। এর মাধ্যমে মসজিদ উদ্বোধন হয়। ১৯৯১ সালের ১৭ জুলাই মোহতরম মাহমুদ আহমদ সাহেব শাহেদ আমীর এবং মিশনারী ইনচার্জ হিসেবে অষ্ট্রেলিয়া গমন করেন। ২০০৬ সালের ১১ এপ্রিল তারিখে খলীফাতুল মসীহ্ খামেস (আই.) অষ্ট্রেলিয়া সফর করেন। ১৪ থেকে ১৬ এপ্রিল ২০০৬ তারিখে তিনি সেখানকার জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করেন। কোন খলীফাতুল মসীহ্ -এর এটাই ছিল প্রথম অষ্ট্রেলিয়ার সালানা জলসায় যোগদান।

২০০৬ সালের ১২ এপ্রিল তারিখে হুযূর (আই.) খিলাফত জুবিলী হলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ২২ এপ্রিল তারিখে হুযূর (আই.) জামা'তের কেন্দ্র "বাইতুল মাসরূর"-এর উদ্বোধন করেন। হুযূর (আই.) লাইব্রেরীও পরিদর্শন করেন। হুযূর (আই.) এর সমীপে লাইব্রেরীর নাম রাখার আবেদন জানানো হলে তিনি এর নাম "হোসেন মুসা" রাখেন। Mrs. Juen weissel হুযূর (আই.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। একজন আহমদী যখন তাকে জিজ্ঞাসা করেন আমাদের হুযূর (আই.)কে কেমন লেগেছে? তিনি উত্তরে বলেন, "তিনি আল্লাহ্ তাআলার মনোনিত ব্যক্তি।" (He is the chosen one) (আলফযল, বার্ষিক সংখ্যা, ১৮ ডিসেম্বর ২০০৬)

নিউজিল্যান্ড

১৯০৮ সনের ১২ ও ১৮ মে তারিখে ইংল্যান্ডের Prof. Wragge হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। প্রফেসর সাহেব পরবর্তীতে নিউজিল্যান্ডে চলে যান। ২০০৬ এর শুরুতে জামা'ত যখন মরহুম প্রফেসার সাহেবের ব্যাপারে খোঁজ খবর নেয় তখন জানতে পারে ১৯২২ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। প্রফেসর সাহেবের এক পৌত্রের এবং পৌত্রীর সাথে জামা'তের যোগাযোগ হয়। ২০০৬ সালের ৬ মে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ খামেস (আই.) নিউজিল্যান্ড সফরকালীন সময়ে এই দুই জনের সাথে সাক্ষাৎ করেন। হুযূর (আই.) নিউজিল্যান্ড জামা'তের আমীর সাহেবকে বলেন, "তাদের সাথে যোগাযোগ রাখুন এবং আল্লাহ্ করুন তাদের হৃদয় যেন সত্যের দিকে ধাবিত হয়।" [আল ফযল, ২০ জুন ২০০৬ পৃষ্ঠা-৫, কলাম-২]

২০০৬ সালের ৭ মে তারিখে হুযূর Prof. Wragge সাহেবের কবর জিয়ারত করেন। জামা'তের কেন্দ্র "বায়তুল মুকিত" নিউজিল্যান্ডের রাজধানী অকল্যান্ডে অবস্থিত। ১৯৯৮ সনে এই জায়গা ক্রয় করা হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ খামেস (আই.) ২০০৬ সালের ৪-৮ মে নিউজিল্যান্ড সফর করেন। ৫ মে তারিখে জুমুআর খুতবার মাধ্যমে জলসা সালানার উদ্বোধন হয়। এখান থেকে কোন খলীফাতুল মসীহ্-এর এটাই সর্বপ্রথম MTA-তে সরাসরি খুৎবা প্রদান। (চলবে)

[তাহরীকে জাদীদের খিলাফত শতবার্ষিকী স্মরণিকা অবলম্বনে]

মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব
মুহাম্মদ আব্দুল মোমেন

প্রকাশিত হয়েছে–
"আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী স্মরণিকা"

তথ্যবহুল ও ইতিহাস সমৃদ্ধ মূল্যবান এ স্মরণিকাটি সুদৃশ্য ও মনোরম ছবি সম্বলিত এবং সুখপাঠ্য প্রবন্ধে সমৃদ্ধ
এটি পাঠ করুন ও নিজের সংগ্রহে রাখুন
যোগাযোগ :
কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
সেল ফোন : ০১৭৩৬-১২৪৭০৪, ০১৯১২-৭০৪৭৬৯

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর পুস্তকসমূহ পাঠের গুরুত্ব ও উপকারিতা

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) শেষ যুগের ব্যাপারে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন সে গুলোর মধ্যে একটি এটিও ছিল যে, এমন যুগ আসবে যখন ধর্ম কেবল নাম মাত্র থাকবে আর কুরআন করীমের শুধু অক্ষর অবশিষ্ট থাকবে এবং আলেমরা এই ধরাপৃষ্ঠে নিকৃষ্ট জীব হবে।

সুতরাং এরকম সময়েই আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে প্রেরণ করেছেন যেন তার মাধ্যমে পুনরায় ধর্ম সঞ্জীবিত হয় এবং মুহাম্মদ (সা.) এর নাম পৃথিবীতে পুণরায় উদ্ভাসিত হয় এবং কুরআন করীমের প্রকৃত বিষয় ও উত্তম শিক্ষা লোকদের নিকট পৌঁছায়। আর তেমনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খোদা তাআলার সাহায্য সহযোগিতায় ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা দুনিয়াবাসীকে জানিয়েছেন। তিনি (আ.) জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের সমুদ্র প্রবর্তন করেছেন আর নিষ্প্রাণ পৃথিবীকে জীবিত করে তা দেখিয়েছেন। "সুলতানুল কলম" সেই আধ্যাত্মিক ধন-ভান্ডার যা পৃথিবীবাসীর সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন যার ব্যাপারে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, যখন মসীহ্ আগমন করবেন তখন তিনি এত সম্পদ পৃথিবীকে দিবেন যে সেটা গ্রহণ করার লোক থাকবে না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সকল পুস্তক ও মালফুযাত সেই ধনভান্ডার ও সম্পদের সমারোহ। সেগুলোতেই সৌন্দর্যমন্ডিত সেই মনি মানিক্য মতি রয়েছে যা মানুষের ইহকাল ও পরকাল লাভের জন্য যথেষ্ট।

পুস্তক পাঠের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব :

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ২৭ ডিসেম্বর ১৯২০ জলসা সালানায় বলেন,

"তোমরা অবশ্যই অন্যান্য বিষয়ে লেখাপড়া কর কিন্তু ধর্মীয় জ্ঞান অবশ্যই অর্জন কর এবং নিজের ভিতরে ধর্মীয় বিষয়াবলী বুঝার ও গ্রহণ করার ক্ষমতা সৃষ্টি কর। সেটার জন্য প্রথম তো কুরআন শিখো আর দ্বিতীয়ত হযরত সাহেবের (আ.) পুস্তকসমূহ পাঠ কর। আর অবশ্যই স্মরণ রেখো হযরত সাহেবের পুস্তকসমূহ কুরআনের তফসীর"।

ফিরিশ্তাগণের অবতীর্ণ হওয়া :

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন,

"যে পুস্তকসমূহ এমন একজন লিখেছেন যার ওপর ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হত, তাই এমন পুস্তকটি পাঠ করলেও ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি হযরত সাহেবের পুস্তকসমূহ পাঠ করবে তার ওপরও ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হবে।"

(মালায়েকাতুল্লাহ্)

প্রত্যেকটি আহমদীর আত্মা :

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন, সুতরাং কুরআন করীমের সেই তফসীর যা বর্তমান সময়ের প্রয়োজনীয়তাকে পূরণকারী তা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকাদিতে পাওয়া যায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সেই জ্ঞানভান্ডার যা তাঁর পুস্তকসমূহে পাওয়া যায় তা প্রতিটি আহমদীর জীবন ও আত্মা। যদি আপনারা সেই পুস্তকসমূহ বা সেই পুস্তক সমূহে বর্ণিত জ্ঞান অর্জন থেকে বঞ্চিত থাকেন তাহলে আহমদীয়াত তো প্রসার লাভ করবে না। বরং তোমরা এরূপ এক নিষ্প্রাণ শরীর হয়ে যাবে যার মাঝে কোন জীবনীশক্তি থাকবে না।"

(মাশায়েলে রাহ)

প্রত্যহ পাঠের উপদেশ : হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) আহমদী ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এবং যুবকদের নসিহত করতে গিয়ে ১৩ মে ১৯৬৭ বাৎসরিক তালিমী ক্লাসের সমাপনী অধিবেশনে বলেন,

"সেই প্রকৃত নসিহত যা আমি এখন ছেলে-মেয়েদের করতে চাই তা হচ্ছে এই যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর পুস্তক সমূহ পাঠের অভ্যাস গড়ে তুলুন। প্রত্যহ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর যে কোন পুস্তক বা মালফুযাতের যে কোন অংশ পড়ুন। মালফুযাত থেকে যদি আপনি আরম্ভ করেন তাহলে সবচেয়ে উত্তম কেননা তাতে যে বিষয়সমূহ বর্ণিত হয়েছে তা সাধারণভাবে বোধগম্য বিষয়।"

তিনি (রাহে.) আরো বলেন,

"যেভাবে বানানো সদ্য সিমেন্টের নতুন দেয়ালে আপনি নখ দ্বারা চিহ্ন করতে পারেন অনুরূপভাবে আপনাদের বংশধরদের ওপর শয়তান রেখাপাত করার চেষ্টা করে। আর সেটার চিকিৎসা হচ্ছে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর পুস্তক বেশী থেকে বেশী পড়া। এই কাজ আপনি কোন আলাদা সময় না বের করেই করতে পারেন। শুধু নিয়্যত করা আবশ্যক। যদি আপনি পাঁচ পৃষ্ঠাও প্রতিদিন পড়েন তো একমাসে আপনি ১৫০ এবং বছরে ১৮০০ পৃষ্ঠা পড়ে ফেলবেন। যদি আপনারা এখান থেকে শপথ নিয়ে যান যে, আমরা প্রতিদিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকের পাঁচ পৃষ্ঠা পড়ব। বরং আমি পাঁচের শপথকেও ছেড়ে দিচ্ছি যদি আপনারা প্রত্যেহ তিন পৃষ্ঠা পড়ার অঙ্গীকার করেন। তাহলে আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি যে, খুব অল্পদিনেই আপনাদের মাঝে এক অদ্ভুত পরিবর্তন আসবে। আর আল্লাহ্

তাআলার ফযলসমূহ আপনাদের ওপর অবতীর্ণ হবে। খোদা তাআলার ফযল ও রহমতে আপনাদের এরূপ অংশ লাভ হবে যে, আপনারা পৃথিবীবাসীকে গোলক ধাঁধাঁয় নিমজ্জিতকারী হবেন। এ ব্যাপারে সামান্য মনোযোগের প্রয়োজন। অত:পর আপনারা খোদা তাআলার দরবারে তার এরূপ বান্দা বলে পরিগণিত হবেন যা তার প্রিয় বান্দাগণ হয়ে থাকেন। আপনারা পৃথিবীর জন্য আদর্শ ও পথ প্রদর্শক হয়ে যাবেন এবং খোদা তাআলার কল্যাণসমূহ আপনারা লাভ করবেন। কিন্তু এই পথ প্রদর্শক ও আদর্শবান এবং খোদা তাআলার কল্যাণসমূহের অর্জন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বর্ণনাকৃত কুরআনের তফসীরের বাহিরে অর্জিত হতে পারবে না। এর ফলে আপনার লেখাপড়ায় অথবা আপনি কোন অন্য কাজ করছেন তো আপনার কাজে কখনোই কোন ব্যাঘাত পড়বে না। বরং এই পড়া ভাল প্রভাব ফেলবে। যদি আপনাদের কেউ ছাত্র হোন তাহলে এটা পড়ার কারণে তার ব্রেনে, মসৃণতার সৃষ্টি হবে। আর তার ভিতরে একটি জ্যোতির সৃষ্টি হবে। অত:পর সে অন্যান্য বিষয় যেমন ক্যামিষ্ট্রি, ইংরেজী ও অন্যান্যগুলোকে খুব সহজেই বুঝতে পারবে এবং পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাবে। যদি সে কোন কাজ করে তাহলে তার কাছে তা সহজতর হবে।" (মাশায়েলে রাহ)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ধর্মীয় শিক্ষাকে খুব সুন্দর ও বিস্তারিত ভাবে নিজের পুস্তকসমূহে বর্ণনা করেছেন এ ধনভান্ডারের প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত। এর মাঝে কুরআন করীমের তফসীর নিহিত। আঁ হযরত (সা.) এর সৌন্দর্য্য ও অনুগ্রহের উল্লেখ এতে রয়েছে। এতে খোদা তাআলার গুণাবলীর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। আর তিনি পৃথিবীবাসীকে সেই খোদা, সেই মহান, করীম, রহীম, রাজ্জাক এবং সমস্ত শক্তি ও প্রশস্ততা ও পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী খোদার চেহারা দেখিয়েছেন যাকে মানবজাতি ভুলে গিয়েছিল। এই পুস্তকসমূহে আরো উত্তম পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন আর সমস্ত বিশ্বাসের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। সুতরাং এই আধ্যাত্মিক খাবারের মূল্যায়ন করা উচিত এবং তা থেকে কল্যাণ লাভ করা দরকার।

হযরত আকদাসের রচনা পদ্ধতি :

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ১০ জুলাই ১৯৩১ জামা'তের লেখকবৃন্দ সদস্যগণ ও প্রাবন্ধিকগণকে এই আহ্বান করেন যে,তারা যেন হযরত আকদাসের লেখনীর পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি বলেন :

"হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্তা থেকে পৃথিবীতে যে অঢেল কল্যাণ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে একটি বড় কল্যাণ হচ্ছে তার লেখনীসমূহ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর রচনাসমূহও সম্পূর্ণ খোদা প্রদত্ত। আর সেগুলোর মাঝে আধ্যাত্মিকতা ও বাগ্মীতাপূর্ণ শব্দাবলী পাওয়া যায়। এগুলো এরূপ প্রবন্ধসমূহের সমারোহ যার ব্যাপারে সাধারণত পৃথিবীবাসী অবগত নয়। কেননা নবীদের বাক্য স্ববিরোধিতা, মিথ্যা ও লৌকিকতা থেকে মুক্ত হয়। এর ভিতর একটি এরকম ধারাবাহিকতা ও আকর্ষন পরিলক্ষিত হয় যে, যে যে ব্যক্তি এটিকে পাঠ করে এমন মনে হয় যেন শব্দগুলো থেকে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ বের হয়ে তাদের শরীরের সাথে মিশে যাচ্ছে। এটি মারাত্মক অকৃতজ্ঞতা ও অমর্যাদা হবে যদি আমরা এই মহা মর্যাদাবান রচনাবলী সমূহকে পর্যালোচনা করে নিজেদের রচনাবলী অনুরূপ না বানাই। (আল ফযল, ১৬ জুলাই ১৯৩১)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এর দিকনির্দেশনা :

"এটি আমি পূর্বেও বলেছি যে, বর্তমান যুগে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকসমূহকে পাঠ করার প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। আর তা থেকে কল্যাণও লাভ করা উচিত। এটিও কুরআন করীমের একটি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ যা আমরা তাঁর (আ.) পুস্তক থেকে পাই।

এদিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত আর এই পুস্তকসমূহ অবশ্যই পড়া উচিত। এই পুস্তকসমূহ থেকে আপনি দলিল প্রমাণ পেতে পারেন যা থেকে লোকদের আপত্তিসমূহের উত্তর প্রদান করতে পারেন। আর তাঁর (আ.) সভা থেকে, তাঁর সাহচার্য থেকে ফায়দা লাভের এটাই মাধ্যম। আমি প্রথমেও বলেছি যে, তাঁর পুস্তকসমূহ পাঠের প্রতি বেশী থেকে বেশী দৃষ্টি দিন। এর ফলে বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তির উত্তরও পাব এবং কুরআন করীমের তত্ত্বজ্ঞানও আমরা লাভ করতে সক্ষম হব। [তথ্য: মাসিক খালিদ] (মাশায়ালে রাহ)

সুতরাং প্রতিটি আহমদী আবাল বৃদ্ধ বণিতার জন্য এটা আবশ্যকীয় যে তারা যেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকসমূহ পাঠ করে তা থেকে জ্ঞানও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে নিজেদের হৃদয় ও মস্তিষ্ককে আলো ও জ্যোতি পৌঁছায়। কেননা বর্তমান যুগে জ্ঞান লাভের আর কুরআন করীমকে বুঝার ও হযরত রাসূলে করীম (সা.) এর হাদীসসমূহের মর্মাথ উপলব্ধি করার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকসমূহ। সেই সাথে আরো বলতে চাই বর্তমান যুগের অবক্ষয় থেকে নিজেকে ও পরিবার পরিজনকে মুক্ত রাখার সবচেয়ে উত্তম উপায় বা রাস্তা হচ্ছে নিজেদের ঘরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকসমূহের চর্চা করা। যদি আগামী প্রজন্মকে ভাল ও নেক রেখে যেতে চান তাহলে নিজেদের ঘরে ইমাম মাহদী (আ.)-এর পুস্তকের চর্চা প্রত্যেহ আবশ্যকীয় করে নিন। মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এর গুরুত্ব বুঝার তৌফিক দান করুন, আমীন।

সংকলন ও অনুবাদ :

মসজিদগুলো বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হবে

হযরত রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন, *'মানুষের ওপর এমন এক সময় আসবে, যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলো অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মসজিদগুলো বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হবে, কিন্তু হেদায়াতশূন্য থাকবে। তাদের আলেমরা আকাশের নিম্নস্থ সব সৃষ্টজীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হবে। তাদের মধ্য থেকে ফেৎনা-ফাসাদ উঠবে এবং তাদের মধ্যেই ফিরে যাবে'* (মিশকাত)।

বাসে বসে কোথাও যাচ্ছিলাম, পাশে বসা দু'ভদ্রলোক আলোচনা করছেন বর্তমান জামানার নানান বিষয় নিয়ে। একজন বলছেন, আখেরী জামানাতো এটাই। বলুন, এমন কোন জিনিষটা বাকী রয়েছে যা এখনও ঘটে নাই। আমি দেখি রাসূল করীম (সা.) যা যা ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন সবই বর্তমানে ঘটে চলছে। সে দিন এক মসজিদে গেলাম নামায আদায় করতে, গিয়ে দেখি আযানের সময়তো শেষ হয়ে গেছেই নামাযের সময়ও শেষ হতে চলেছে কিন্তু মসজিদে নামায আদায় করতে কেউই আসছে না। তড়িঘরি করে ইমাম সাহেব ও অন্যান্য কয়েকজন আসলেন, নামায আদায় করলাম। নামায শেষে ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, মসজিদতো বেশ সুন্দর কিন্তু মুসল্লি এত কম কেন? তিনি বলেন, সবাই কাজ কর্মে ব্যস্ত থাকে তাই।

আসলে আজ আমরা যে জামানায় বাস করছি এবং রাসূল করীম (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতানুযায়ী বলতে পারি এটাই আখেরী জামানা। একটু ভেবে দেখুন, রাসূল করীম (সা.) বলেছেন- 'মানুষের ওপর এমন এক সময় আসবে, যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলো অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মসজিদগুলো বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হবে, কিন্তু হেদায়াতশূন্য থাকবে, তাদের আলেমরা আকাশের নিম্নস্থ সব সৃষ্টজীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হবে। তাদের মধ্য থেকে ফেৎনা-ফাসাদ উঠবে এবং তাদের মধ্যেই ফিরে যাবে'। এসবের পূর্ণতার বাস্তব সাক্ষী কি আমরা নই?

আজ ইসলামের কেবল নামই অবশিষ্ট রয়েছে, প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা নাই বললেই চলে। যে যার মত ধর্মের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে ইসলামকে কলুষিত করছে। প্রতিটি ঘরেই পবিত্র কুরআন আছে এবং খুবই যত্নের সাথে গিলাফ পড়িয়ে রাখা হয় কিন্তু বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে ঠিকই একবারও তা পড়ার ইচ্ছে হয় না আর পড়লেও আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কি আদেশ করেছেন তা বুঝার চেষ্টা করি না। আলেমরা কুরআন মুখস্থও করছে কিন্তু হেদায়াত পাচ্ছে না। কারণ তারা এটা মুখস্থ করছেনই অর্থ উপার্জনের জন্য। এবিষয়ে এখন কিছু বলতে চাচ্ছি না মসজিদ নিয়ে দুকলাম লিখতে চাই।

বর্তমান অলি-গলিতে মসজিদ আর মসজিদ দৃষ্টিতে পরে। সে মসজিদ গুলো কতইনা জাকজমকপূর্ণ। মসজিদগুলোতে অনেক মূল্যবান কার্পেট, সমস্ত মসজিদ মোজাইক করা, টাইলস বসানো। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। কতইনা উন্নত সব ব্যবস্থাপনা। যা দেখলে মনেই হবে না মসজিদের দেয়াল ঘেষা যে পরিবারটি অবস্থান করছে তাদের ছেলে মেয়েরা না খেয়ে দিনাতিপাত করছে। এ খেয়াল কি কোন মসজিদ কমিটি বা ইমাম সাহেবের আছে? শ্রদ্ধেয় এক ভাই যথার্থই আমাকে বলেছিলেন, দেখবি আর কদিন পর মসজিদগুলোতে লিফটের ব্যবস্থাও করা হবে। ঠিক তেমনই করা হচ্ছে। আজ আমরা দেখতে পাই এ মহল্লার মসজিদ যদি টাইলস করা শুরু করে তাহলে অন্য মহল্লার মসজিদে এসি লাগানো শুরু করে দেয়। কার মসজিদ কত সুন্দর করতে পারে এ নিয়ে বাড়াবাড়ি শুরু করে দেয় এবং অহংকার ও গর্বের সাথে বলে বেড়ায় আমাদের মসজিদ, গিয়ে দেখে আয়।

এই যে সুন্দর সুন্দর আর আড়ম্বরপূর্ণ মসজিদ এগুলোতে নামায পড়লেই কি কেবল আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবো, না হৃদয় স্বচ্ছ করে পবিত্র আত্মা নিয়ে তাঁকে লাভ করতে পারি? আমার হৃদয় যদি পরিস্কার হয় আর সকল মন্দ কাজ পরিহার করে চলি সেক্ষেত্রে আমি যেখানেই নামায আদায় করি না কেন আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে। এছাড়া যত উন্নত মসজিদই বানাইনা কেন, কোন কাজে আসবে না। মসজিদ হতে হবে হেদায়াতের কারণ বড়াই করা নয়। আমাদের প্রিয় নবী (সা.) এর মসজিদ কেমন ছিল? তিনিতো খুবই সাধারণ জীবন যাপন করতেন এবং তাঁর মসজিদও ছিল অতি সাধারণ।

মসজিদ আল্লাহর ঘর এবং সবচেয়ে পবিত্র স্থান। হাদিসে উলেখ রয়েছে, হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন-

'ময়লা আবর্জনা মসজিদের মর্যাদা ও পবিত্রতার পরিপন্থী। মসজিদ হলো আল্লাহর যিকির করার ও কুরআন তিলাওয়াতের স্থান' (মুসলিম)

বর্তমানে দেখতে পাই মসজিদের নামে চলছে খুব সূক্ষ্ম চাঁদাবাজি। আজীবন মসজিদের নামে টাকা উঠাচ্ছে এ টাকা কোথায় কত খরচ হচ্ছে এর কোন হদিস নেই। মসজিদকে এখন বানানো হয়েছে ব্যবসার মাধ্যম। এ ব্যবসায় কোন পুঁজি লাগে না। এসব দেখে যে কেউ বলবে এখনই আখেরি জামানা ও ইমাম মাহদীর যুগ। তাই সকলের প্রতি আবেদন যুগের লক্ষণ অনুধাবন করে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর সন্ধান করুন এবং তাঁর হাতে বয়আত গ্রহণ করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করুন।

মাহমুদ আহমদ সুমন

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) এর বাংলাদেশ সফর

(১১তম কিস্তি)

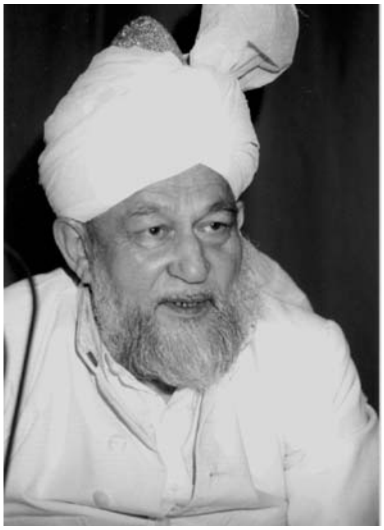

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)

১৯৬৯ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে রাজনৈতিক অঙ্গনে যখন উত্তাল তরঙ্গ বিরাজমান, তখন হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) একদা ঢাকা শুভাগমন করেন। জামা'তে আহমদীয়ার বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের পর একদিন ডাক্তার আব্দুস সামাদ খান চৌধুরীসহ শেখ সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সৌজন্য আলোচনা হয়।

তখন সফরকালে মির্যা সাহেব সড়কপথে ফরিদপুর যান। সে সময় ফরিদপুরের ন্যাশনাল ব্যাংকের ম্যানেজার ছিলেন ভিজির আলী সাহেব। তিনি সম্মানিত অতিথি এবং সফরসঙ্গী প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর মৌলভী মোহাম্মাদ সাহেবসহ অন্যান্যদের আতিথেয়তা ব্যবস্থা করেন। তবলীগের উদ্দেশ্যে সুধী সমাবেশ করা হয়। তখন বরিশালের জেলা প্রশাসক ছিলেন সোহেল আহমদ সিএসপি। তিনি পাঞ্জাবের আহমদী। তাঁর আমন্ত্রণে মির্যা সাহেব বরিশাল যান। প্রশাসনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে তবলিগী আলোচনা করা হয়। তখন মৌলভী মোহাম্মাদ সাহেবের সাথে তিনি আহমদনগরও সফর করেছেন।

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)-এর এদেশে সফর প্রসঙ্গে বর্তমান ন্যাশনাল আমীর বাংলাদেশ মোহতরম মোবাশ্শের উর রহমান সাহেবের সহধর্মিণী লায়লা রহমান সাহেবা স্মৃতিচারণে বলেন–

"১৯৬১ সালে সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) যখন বাংলাদেশের বিভিন্ন জামা'ত সফরে আসেন তখন আমরা গাইবান্ধায় ছিলাম। আমার বাবা ভিজির আলী সাহেব গাইবান্ধার তৎকালীন ন্যাশনাল ব্যাংক বর্তমান সোনালী ব্যাংক লি: এর ম্যানেজার ছিলেন। তিনি তাঁর সফর সঙ্গীসহ গাইবান্ধায় তসরিফ আনেন। আমার বাবা এ মহান অতিথির শুভাগমন উপলক্ষে তবলীগি সভার আয়োজন করেন। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণে তবলীগি সভা করা হয়। আমরা মেয়েদের সরাসরি তাঁর সাক্ষাতের সুযোগ না হলেও বাবার কাছে তাঁর অনেক প্রশংসা শুনি। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে তার বিনয়ী ব্যবহার সকলকে অভিভূত করে। ভ্রমণের সময় তিনি প্রায়ই বই পড়তেন। রাতে শুবার সময় বই নিয়ে শুইতেন এবং পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে যেতেন।

তিনি পুনরায় সম্ভবত ১৯৬২ সালে যখন বাংলাদেশ সফরে আসেন তখন আমরা দিনাজপুর ছিলাম। আমাদের বাসায় তাঁর শুভাগমন হয়। বাসার হলরুমে দিনাজপুরের বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে ধর্মীয় আলোচনা সভা হয়। তাঁর জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় সকলেই মুগ্ধ হন। আমরা মেয়েরা পর্দার আড়াল থেকে এসব অনুষ্ঠান শুনি। তখন আমার কচি মনে বোধগম্য হয় তিনি একজন মহৎ ব্যক্তি। আহমদীয়া জামা'তের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।

১৯৬৮ কিংবা ১৯৬৯ সালে সফরকালে তিনি ফরিদপুর যান। তখন আমার বাবা ফরিদপুরে কর্মরত ছিলেন। আমাদের বাসায় তাঁর পদধূলী পরে। আমার মা-বাবা এ মহিমান্বিত অতিথিকে আন্তরিক ভাবে আদর আপ্যায়ন করেন। তিনি বাঙালিদের আতিথেয়তায় অভিভূত হন। আমরা তাঁর অনেক দোয়া ও স্নেহাশীষ লাভ করি।

১৯৮২ সালে হুযূর রাবে (রাহে.) খিলাফতের মসনদে আসীন হওয়ার পর আমরা নিজদেরকে বড়ই সৌভাগ্যবান মনে করি। কেননা এ মহানুভব খোদার মনোনীত খলীফার এক সময় আমাদের বাসায় শুভাগমন হয়। তাঁর চরণধূলীতে আমাদের পরিবার এবং এদেশের আহমদীরা ধন্য হয়েছে। তাই তাঁর সাক্ষাৎ এবং দোয়া লাভের বাসনা জন্মে। অবশেষে ১৯৯৪ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সালানা জলসায় যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করি। তখন মনটা আনন্দে ভরে যায়। জলসায় মেয়েদের অংশে যখন হুযূর (রাহে.) প্রবেশ করেন তখন তাঁর সুন্দর, স্নিগ্ধ চেহারা দেখে আমি বিস্ময়াভিভূত হই। যাটের দশকে যখন তিনি বাংলাদেশ এসেছিলেন তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বংশধর হিসেবে তাঁকে স্বতন্ত্র এক মহান ব্যক্তি মনে করি। আর আজ তাঁকে আল্লাহ্‌র খলীফা হিসেবে ঐশী নূরের পরশে নূরান্বিত বোধগম্য হয়। মনে হয় তিনি আমাদের কত আপনজন। চির পরিচিত মানুষ। ঐশী নূরে জ্যোতিষমান। আমাদের সকল সুখ-দু:খের অংশীদার তিনি। আল্লাহর বিশেষ কুদরত, খলীফা তিনি এমন মানুষকেই নির্ধারণ করেন, যার কাছে আমাদের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দু:খ আমরা প্রকাশ করতে পারি। বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত, আলোর দিশারী, আধ্যাত্মিক জগতের নেতা তিনি।

জলসার অধিবেশনে হুযূর (রাহে.)কে দেখার পর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মহিলাদের সাথে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানেও দেখা হয়। তখন আমি আমার পরিচয়ে বাবার নাম বলতেই হুযূর চিনতে পারেন এবং আমাকে থামিয়ে নিজেই তাঁর ফরিদপুর ভ্রমণের স্মৃতিচারণ করেন। সেখানে একটি গাড়ী দুর্ঘটনা ঘটে এবং কিভাবে আল্লাহ্ তাআলা রক্ষা করেছিলেন তা বর্ণনা করেন। হুযূরের স্মৃতিশক্তির কথা শুধু শুনেছিলাম, এবার তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়। তিনি (রাহে.) আমাকে জিজ্ঞাস করেন–'তোমাদের বাসায় যখন আমি গিয়েছিলাম তখন তুমি কত বড় ছিলে?' আবার তিনি নিজেই হাত দেখিয়ে বললেন, 'এত ছোট ছিলে মনে হচ্ছে।' আমি বললাম–জ্বী হুযূর এতোটুকুই ছিলাম। এরপর ব্যক্তিগত সাক্ষাতের সুযোগ পাই। আমি ও আমার স্বামী জনাব মোবাশ্শের উর রহমান সাক্ষাৎ করি। হুযূর আমাদের কথা অত্যন্ত

মনোযোগ দিয়ে শুনেন। আমি অনেক দিন থেকে অসুস্থ ছিলাম। ডাক্তাররা রোগ নির্ণয় করতে পারছিল না। হুযুরকে তা সবিনয়ে বলি। তিনি আমাকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দেন। আশ্চর্যের বিষয় আমি নিজে উর্দু বলতে পারি না। কিন্তু আল্লাহ্‌র ফজলে সেদিন আমি হযূরের সাথে অবলীলায় উর্দু বলেছি। অবশ্য হুযূর আমার উর্দু বলা শুনে মিটি মিটি হাসছিলেন। আমি দোয়া করছিলাম-যেন হুযূরের সাথে উর্দুতে কথা বলতে পারি। আমার সে আশা পূর্ণ হয়। এখন কোন উর্দুভাষীর সাথে কথা বলতে সংকোচ বোধ করলে আমার স্বামী বলেন, 'হুযূরের সাথে তো কথা বলেছ, এখন ভয় হচ্ছে কেন?' সাক্ষাৎ শেষে হুযূরের সাথে ছবি তুলে আমরা বিদায় নেই।

হুযূর (রাহে.) কথা যখনই মনে পড়ে তখনই তাঁর হাস্যোজ্জ্বল নূরানী চেহারা, আর অমায়িক ব্যবহারের কথা মনে হয়। বিশেষ করে যখন তাঁর কোন বক্তৃতা MTA তে শুনি। আল্লাহ্‌র অশেষ রহমত এ বীরপুরুষের হাতে MTA প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে নিজ সন্নিধানে পরম ভালোবাসায় গ্রহণ করুন, আমীন।"

আমাতুস সামী রহমান বেবী সাহেবা স্মৃতিচারণে বলেন,

১৯৬০ সালে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর ভবিষ্যদ্বাণীর ফসল তাঁর শুভ সন্তান হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর পুত্র এবং মাহদী (আ.)-এর পবিত্র রক্ত ধারা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) আমাদের মাঝে শুভাগমন করছেন, শুনে আহমদনগরের সকল ভাই ও বোনেরা ছুটে আসেন তাঁকে এক নজর দেখার জন্য। সুন্দর সুঠাম নৌজোয়ান, ফর্সা, নূরানী চেহারা জ্বলজ্বল করছে। ঐশী নূরে যেন আলো ঝলসে পড়ছে। খবর পেয়ে আমার আব্বা নূর উদ্দিন আফ্রাদ সাহেবও ছুটি নিয়ে চলে আসেন।

প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর তখন জামা'তের কাঁচা মসজিদ। এখানেই আসন গ্রহণ করেন ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)। দেখার জন্য তখন তাঁর পাশে সবাই ভীড় জমায়। তাঁকে কাছে পেয়ে সবাই খুশীতে আত্মহারা, সকলের দৃষ্টি শুধু তাঁর দিকে। সবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রাণ খুলে কথা বলেন, তাঁর মনমুগ্ধকর বাণী গভীর ভাবে শুনেন। রাতভর সাক্ষাৎকার চলে। সাবেক আমীর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের বৈঠকখানার কাঁচা ঘরেই তাঁর আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়। পরদিন আমাদের বাড়িতে আতিথেয়তা গ্রহণ করে আমাদেরকেও ধন্য করেছেন। আমার আম্মার হাতের রান্নার প্রশংসা করেন। যোহর ও আসর নামায আমাদের বৈঠকখানায় আদায় করেন। পর্দার আড়াল থেকে আম্মা, খালাম্মা ও আরো ক'জন এই বিশিষ্ট ইমামের পেছনে নামায পড়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। আম্মা তখন আহমদনগর জামা'তের লাজনার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। কিভাবে লাজনার বোনদের সঠিক তরবিয়ত করা যায় এ বিষয়ে তিনি উপদেশ দেন।

আমার বয়স তখন ৫/৬ বছর। আমাকে আদর করে তিনি তাঁর কোলে নেন, ছবি তোলেন এবং বলেন, 'তুমি নাকি নযম শিখেছ! আমাকে একটি নযম শুনাবে?' আমি আধো আধো ভাবে বলি-'আল্লাহ্ কে পেয়ারো কো তুম কেয়ছে বুরা ছামঝে........'। তিনি খুব খুশী হন। আমার হাতে টাকা উপহার দেন। বলেন-'তুমি কুরআন তেলাওয়াত ও নযম আরো সুন্দর ভাবে শিখবে'।

আমাদের বাড়ীটি তখন আট বিঘা জমির ওপর ছিল। তিনি ঘুরে ঘুরে তা দেখেন। পিছনে বাঁশ বাগান। এক পাশে সারি সারি ফলের গাছ। বাড়ীর সামনে দু'ধারে গোলাপসহ বিভিন্ন জাতের ফুলে সজ্জিত সৌরভ ছড়ানো। চার পাশে নানা রঙের পাতাবাহার দিয়ে ঘেরা। মাঝখান দিয়ে বাড়ীতে প্রবেশের জন্য দুর্বা ঘাস দিয়ে তৈরী সবুজ নরম গালিচা। বেলী ফুলের ডাল-পালায় আবৃত গেইট। গেইটের দু'পাশে যেন প্রহরায় ছাতার মত দাঁড়িয়ে খুশবু ছড়াচ্ছে দু'টি কামিনী ফুলের গাছ। গোড়ায় সাদা অর্ধ ইটের বেষ্টনী। ভিতরে সৌরভ বিহীন লাল ফুল ইত্যাদি দৃশ্যপট দেখে তিনি খুব খুশী হন। আব্বাকে বলেন- 'বৃটিশ আর্মিতে ছিলেন তো! বাড়ীটি দেখেই বুঝা যাচ্ছে। আপনি খুব রুচিশীল মানুষ।'

১৯৭৬ সালে রাবওয়ায় মসজিদ মোবারকের সামনে দিয়ে একদিন আমার স্বামী মৌলানা আনিসুর রহমান সাহেব বাচ্চাদের হাত ধরে হাঁটছিলেন। তখন হুযূর (রাহে.) কাশরে খিলাফত (খলীফার আবাসস্থল) থেকে বের হয়ে আসেন। তাঁকে দেখে দাঁড়ালেন, বাচ্চাদেরকে আদর দিলেন এবং বলেন, তোমার বেগম আমাতুস সামী বেবীকে আমার সালাম বলিও। মৌলানা সাহেব বাসায় এসে বলেন, মিঞা সাহেব (তাঁকে মিঞা সাহেব বলা হত তখন)। তোমার ডাক নামও জানেন কিভাবে? তিনি তোমাকে সালাম বলেছেন। আমি সালামের উত্তর নিলাম এবং খুব অবাক হলাম, এতটি বছর পরেও কিভাবে তিনি আমার মত নগন্য মানুষকে স্মরণ রেখেছেন। কি প্রখর ছিল তাঁর স্মৃতি শক্তি।

১৯৭৮ সালে রাবওয়ায় আমি একদিন এ শ্রদ্ধাভাজন মহৎ ব্যক্তির কাছে তিন সন্তানসহ সাক্ষাৎ করতে যাই। তখন তিনি ওয়াকফে জাদীদ অফিসের সামনে বিকালে বসতেন। শত শত রোগী দেখতেন। অনেক জটিল রোগীও দূর-দূরান্ত থেকে আসতেন। সকলকে বিনা মূল্যে তিনি হোমিও ঔষধ দিতেন। কিছুটা ভীড় কমলে আমি সামনে যাই, সালাম জানাই। তিনি সর্বপ্রথমেই জিজ্ঞেসা করেন-'আনিসুর রহমান বাঙালি বাবু কেমন আছে! লন্ডন থেকে ফোন করে হাল-অবস্থা জিজ্ঞেস করে তো'! আমি বললাম, হাঁ মিঞা সাহেব। তিনি বাচ্চাদেরকে দেখলেন, ঔষধ দিলেন এবং বলেন-'তুমিও কিছুদিন পর লন্ডনে চলে যাচ্ছ। যাবার প্রস্তুতি নাও'। ঠিক ক'দিন পর তাহরীক জাদীদ অফিস থেকে জানানো হলো, আমাকে ইংল্যান্ড পাঠানো হবে। আমি শুনে খুবই খুশী হই। কারণ তখন সেখানে আমার পিতা বা শ্বশুরালয়ের কেউ ছিল না। ছোট্ট ছোট্ট তিনটি সন্তান নিয়ে আমি একা ছিলাম।

অন্যদিকে আমার খুব খারাপ লাগছিল যে, অন্যান্য মোবাল্লেগের স্ত্রীগণ বছরের পর বছর স্বামী ছাড়া থাকছেন। কারো কারো মাথায় চুল পাকা ধরছে। যৌবন আশা ইচ্ছা সবকিছু তারা কোরবানী দিচ্ছেন ধর্মের জন্য। সেই তুলনায় আমার কুরবানী তো যৎ সামান্য। এসব ভেবে তাদের সান্তনা দেবার চেষ্টা করি। কিন্তু তাঁরা আমাকে উল্টো বলেন-'আপনার ছোট তিনটি সন্তান, একেবারে একা থাকেন, বাজার করা, তাদের লালন-পালন করা, আপনার দুর্বল শরীর নিয়ে কষ্ট হচ্ছে। আমরা তো আপনাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি। খলীফায়ে ওয়াক্তের ফয়সালা একেবারেই সঠিক। আমরা আপনাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। এই ছিল আধ্যাত্মিকতার পরম দৃষ্টান্ত। (চলবে)

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

খিলাফত হারা মুসলমানদের অমানবিক কর্মকান্ড

(দ্বিতীয় কিস্তি)

বাইবার্সের কৃতিত্ব ও বিচার

বাইবার্স ছিলেন মিসরের মামলুক সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা এবং এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান। তিনি সামান্য একজন কৃতদাস হিসাবে জীবন শুরু করে নিজ প্রতিভা বলে মিশরের সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন এটা তার জন্য কম কৃতিত্বের কথা নয়।

যুগ সন্ধিক্ষণে বাইবার্সের আবির্ভাব ইসলামের ইতিহাসে শুভ সূচনা করেছিল। এই সময় তার আবির্ভাব না হলে মিশরের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিপন্ন হত। এই সম্পর্কে পি, কে হিট্টি বলেন, "যদি মোঙ্গলরা কায়রো অধিকার করত তাহলে তারা এর ধনসম্পদ ও মূল্যবান পান্ডুলিপিসমূহ ধ্বংস করত।"

১২৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ঐতিহাসিক মনসুরার যুদ্ধে সম্মিলিত খ্রীষ্টান ধর্মযুদ্ধাদেরকে এবং ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দে আইন জালুতের যুদ্ধে দুর্ধর্ষ মোঙ্গল শক্তিকে পর্যদস্ত করে সমর ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে রয়েছেন। দীর্ঘ ১৭ বৎসর রাজত্বকালে খ্রীষ্টীয় ধর্মযুদ্ধা মোঙ্গল বাহিনী ও গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাকে অবিরাম যুদ্ধ করতে হয়েছে। শুধু ক্রুসেড বাহিনীর বিরুদ্ধেই তিনি ২১ টি অভিযান পরিচালনা করেন এবং এর প্রত্যেকটিতেই তিনি সাফল্য লাভ করেন। একইভাবে তিনি মোঙ্গলদের সাথে যুদ্ধে কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং ইসমাইলী গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়কে পরাজিত করে তাদের দুর্গগুলি অধিকার করে নেন।

এতদ্ব্যতীত তিনি আর্মেনিয়া খিলিসিয়া, সুদান, নুবিয়া ও এশিয়া মাইনরের সেলজুক তুর্কীদের বিরুদ্ধে অভিযান করে বিজিত রাজ্যগুলিকে কর প্রদানে বাধ্য করেন। বাইবার্সের সময় মামলুক সাম্রাজ্য এশিয়া মাইনর হতে আরব উপদ্বীপ এবং আর্মেনিয়া হতে লুবিয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। সেনাপতি ও বিজেতা হিসাবে এটা তার কৃতিত্বের পরিচায়ক।

বাইবার্স কেবল একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতিই ছিলেন না তিনি একজন সুশাসক ও ছিলেন। তিনি সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন করে তাকে খুব শক্তিশালী করেন। তিনি নৌবাহিনীরও পূনর্গঠন এবং সিরিয়ার দূর্গসমূহ সংস্কার করেন। তিনি খাল খনন, পোতাশ্রয়ের উন্নতি বিধান ও দক্ষ ডাক বিভাগের প্রবর্তন করেন। তিনি অশ্বের সাহায্যে দ্রুত যোগাযোগের মাধ্যমে কায়রো ও দামেশকের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন। তার সুশাসনে দেশে শান্তি ও শৃংখলা বিরাজ করত। বাইবার্স কর্ম শিল্প ও সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তার আমলে সাম্রাজ্যের বহু স্থানে ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। তিনি শিক্ষার প্রসারকল্পে বহু বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সম্রাজ্যের মধ্যে সুন্দর সুন্দর মসজিদ তার স্থাপত্য শিল্পের প্রতি অনুরাগের পরিচয় বহন করে। তিনি কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য উৎসাহ দেন। মিসরের সুলতান হিসাবে তিনিই প্রথম চারটি মাযহাবকে স্বীকার করে প্রত্যেক মাযহাব হতে বিচারক নিযুক্ত করেন। তার কৃতিত্ব সম্বন্ধে অধ্যাপক হিট্টি বলেন, "তার ধর্মীয় গোড়ামী উদ্দীপনা এবং ধর্মীয় যুদ্ধে অর্জিত গৌরব মিলে তাকে হারুন অর রশীদের প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেছে। পৌরনিক ইতিহাসে এটা সালাহউদ্দিনের কৃতিত্বের চাইতেও বেশী মনে হয়"।

কায়রোতে আব্বাসীয় খিলাফতের পুন:প্রতিষ্ঠা বাইবার্স রাজত্ব কালের একটি প্রধান ঘটনা ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গল নেতার হস্তে আব্বাসীয় বংশের শেষ খলিফা আল-মুসতাসিম নিহত হলে মুসলিম বিশ্ব খলীফা শূন্য হয়ে পড়ে। মামলুক সুলতান বাইবার্স এই খিলাফত পুন:প্রতিষ্ঠা করে মুসলিম বিশ্বের এক বিরাট উপকার করেন। ১২৬১ খ্রীষ্টাব্দে দামেশক হতে প্রাণরক্ষাপ্রাপ্ত খলীফা জহিরের (১২২৫–২৬) পুত্রকে কায়রো এনে তাকে আল মুনতাসিম উপাধি দিয়ে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলিম জাহানের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টিতে খিলাফতের পুন:প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

বাইবার্সের রাজত্বকালে বলিষ্ঠ বৈদেশিক নীতির জন্য সমধিক খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি মোঙ্গলদের ও ইউরোপীয় শক্তিসমূহের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। প্রথমে তিনি কিপচাকের মোঙ্গলদের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করেন। সিংহলের সাথে দ্রুত বিনিময় করে তিনি দূর-প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কনষ্ট্যান্টিনোপল, সিসিলি, আরাগণ ও অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হন। তার বৈদেশিক নীতির ফলে মামলুক সাম্রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি পায়। বাইবার্স একজন বিচক্ষণ ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। আনুগত প্রজাদের প্রতি তিনি ছিলেন সহানুভূতিশীল, কিন্তু অবাধ্য আমীরদেরকে তিনি কঠোর শাস্তি দিতেন। তিনি রাজ্যে মদ্যপান ও জুয়াখেলা অবৈধ বলে ঘোষণা করেন। বাইবার্স একজন ধর্মপ্রাণ সুন্নী মুসলমান ছিলেন। সুন্নী ইসলামের গৌরব বৃদ্ধির জন্য তিনি সব কিছুই করতে রাজী ছিলেন তিনি একটি আদর্শ মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিলেন এই সম্বন্ধে ড. ফাতিমা সাধিক বলেন, তার উদ্দেশ্য ছিলো একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করা এবং তার সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী মুসলিম শক্তি হিসাবে গড়ে তোলা।"

সাঈদ, ১২৭৭-৭৯ খ্রী:

সুলতান বাইবার্সের মৃত্যুর পর তার পুত্র মালিক আল সাঈদ সিংহাসনে আরোহন

করেন। কিন্তু আড়াই বৎসর পর তিনি সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। মালিক আল সাঈদের পর তার ভ্রাতা আল সালামিয়া ক্ষমতা প্রপ্ত হন। কিন্তু অল্প কালের মধ্যে তিনি কালাউনের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত হন।

কালাউন, ১২৭৯–১২৯০ খ্রী:বাইবার্সের পর কালাউন ছিলেন মামলুকদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ সুলতান। তিনি তুর্কী জাতীয় ক্রীতদাস ছিলেন। তার মালিক শৈশবে বিক্রয়ের জন্য কিপচাক হতে তাকে মিশরে নিয়ে আসেন। এই সময় মিশরের সুলতান আস-সালেহ তাকে উচ্চমূল্যে ক্রয় করেন। স্বীয় প্রতিভা বলে কালাউন দ্রুত পদোন্নতি লাভ করতে থাকেন এবং বাইবার্সের শাসনামলে প্রভাবশালী আমীরদের মধ্যে অন্যতম বলে গণ্য হন। বাইবার্স স্বীয় পুত্র মালিক আল সাঈদের সাথে কালাউনের কন্যার বিবাহ দেন। বইবার্সের মৃত্যুর পর মালিক আল-সাঈদ শাসনভার গ্রহণ করলে শ্বশুর কালাউনের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। আল সাঈদ সিংহাসন ত্যাগ করার পর তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভ্রাতা আল সালামিস সিংহাসন লাভ করেন এবং কালাউন তার অভিভাবক নিযুক্ত হন। এতে রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতা তার হাতে এসে যায় এবং তিনি ১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সালামিসকে অপসারিত করে নিজে রাজশক্তি অধিকার করেন।

সিংহাসনে আরোহণের পর কালাউন বিভিন্ন দিক হতে বহু সমস্যার সম্মুখীন হলেন। প্রথমেই তাকে আভ্যন্তরীন গোলযোগের মোকাবিলা করতে হয়। কালাউনের ক্ষমতা লাভে ঈর্ষান্বিত হয়ে সিরিয়ার প্রাদেশিক শাসনকর্তা কারা সুন্‌কুর বিদ্রোহী হন এবং নিজেকে স্বাধীন সুলতান হিসাবে ঘোষনা করেন। কারা সুন্‌কুর বাইবার্সের অনেক দাস মরু অঞ্চলের বেদুঈন ও হামাহ্‌র আয়ুবীয় শাহজাদার সাহায্য ও সমর্থন লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত, দামেশকের সমকালীন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও কাজী ইবনে কল্লিখানও সুন্‌কুরের পক্ষ সমর্থন করে তার অনুকূলে ফতোয়া জারি করেন। এতে কালাউন শঙ্কিত হয়ে পড়েন। কারণ এই সময় ক্রুসেডার ও সীমান্তে মোঙ্গলদের তৎপরতা বেড়ে গিয়েছিল। সুতরাং প্রথমেই তিনি দ্রুতগতিতে সিরিয়ার বিদ্রোহী নেতা কারা সুন্‌কুরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন এবং দামেশকের সন্নিকটে জেসুরার যুদ্ধে তাকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করলেন। কারাসুন্‌কুর যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে কোনক্রমে আত্মরক্ষা করলেন। পরে কালাউন তার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করলে তিনি তাকে সাহায্য ও সমর্থন দান করেন।

আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনের পর কালাউন বহি:শত্রুর প্রতি মনোযোগ দেন। তিনি দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ত্রিপলী, তোরতোসা ও আক্কার খ্রীষ্টান শক্তির সাথে সন্ধি স্থাপন করেন। সন্ধির শর্তানুসারে এই সকল অঞ্চলে মিশরীয় পন্যের অবাধ বানিজ্যের পথ সুগম হয় এবং খ্রীষ্টানদের দুর্গ নির্মাণের অধিকার বন্ধ হয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও সুলতান কালাউনের এগারো বৎসরের রাজত্ব কালের অধিকাংশ সময়ই মোঙ্গল ও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অতিবাহিত হয়। সিরিয়ার গোলযোগ দমনের কিছুকাল পরেই পারস্যের ইলখানি মোঙ্গলগণ আবাগা খানের নেতৃত্বে আলেপ্পা অধিকার করে নিয়ে এবং আলেপ্পাবাসীর ওপর নির্মম অত্যাচার চালাল। এতদ্ব্যতীত তারা সিরিয়া থেকে বিতাড়িত করবার জন্য সিরিয়া আক্রমণ করে। মোঙ্গল নেতা হালাকু খানের পুত্র আবাগা ও পৌত্র আরগুণের খ্রীষ্টধর্মের প্রতি বিশেষ ঝোক ছিল। তারা মিশরীয়দিগকে বিতাড়িত করবার উদ্দেশ্যে ইউরোপের খ্রীষ্টানদেরকে নতুন ভাবে ক্রুসেড আরম্ভ করবার জন্য প্ররোচিত করতে থাকলে কালাউন ৫০,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে মোঙ্গলদের ৮০,০০০০ সৈন্যের মোকাবিলা করেন (১২৮০ খ্রী:)। হালাগু খানের পুত্র ও ইলখানি সুলতান আবাগা হিমসের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন। এর কিছুদিন পরে মোঙ্গলগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। মোঙ্গলদের পর্যদস্ত করে সুলতান কালাউন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলেন। প্রথমেই তিনি ধর্মযুদ্ধাদের শক্তিশালী ঘাটি আলমারকার অবরোধ করেন এবং দীর্ঘ' আটত্রিশ দিন পর এটা তার পদানত হল (১২৮৫ খ্রী:)।

অত:পর তিনি উত্তর আফ্রিকায় অবস্থিত খ্রীষ্টানদের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ঘাটি ত্রিপলীর দিকে অভিযান চালালেন (১২৮৯ খ্রী:)। ত্রিপলী রক্ষার্থে সাইপ্রাসের রাজা খ্রীষ্টানগণকে নানাভাবে সহায়তা করলেন। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হলো না। কালাউনের হাতে ত্রিপলীর পতন ঘটল। ত্রিপলীর কাউন্ট সুলতানকে উপকূলবর্তী এলাকা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। এই বিজয়ের পর কালাউন বাতরুন অধিকার করে নেন। তায়াবের রাণী–মার্গারেট রাজ্যের অধিকাংশ কালাউনকে ছেড়ে দিয়ে দশ লক্ষ দিরহাম কর প্রদানের শর্তে তার সঙ্গে সন্ধিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। কালাউন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে পর পর কয়েকটি রাজ্য পরিচালনা করে সিরিয়া তথা এশিয়ায় তাদের শক্তি বহুলাংশে খর্ব করে দেন। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়ার জন্য তিনি আল-মালিক আল মনসুর (বিজয়ী রাজ্য) উপাধিতে ভূষিত হন। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অব্যাহত সংগ্রামে লিপ্ত থাকলে সুলতান কালাউন লুবিয়ার কন্টিক, প্যালেস্টাইনের বেদুঈন ও আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে সাফল্য অর্জন করেন। এতদ্ব্যতীত, ইয়েমেনের শাসনকর্তাকেও তিনি পরাস্ত করেছিলেন। (চলবে)

[অধ্যাপক কে. আলী প্রণীত মুসলিম ও আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস, পৃ: ৮৭–৯৩ থেকে উদ্ধৃত]

সংগ্রহ : **ডা. শেখ হেলাল উদ্দিন আহমদ**

খিদমতে খাল্ক (সৃষ্টির সেবা) সম্বন্ধে খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর তাহ্রীক সমূহ :

বিশ্ব যখন ডুবুডুবু, ধরা যখন টলটলায়মান, মানবাত্মা যখন নিপতিত ছিল এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে ঠিক তখনই আরবের বুকে উদিত হয় শান্তির কান্ডারী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)। সমস্ত পৃথিবীর জন্য তিনি ইসলাম তথা শান্তি বয়ে আনেন। সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব ‘কুরআন মজীদ’ তাঁর (সা.) ওপরই অবতীর্ণ হয়। আর এই কুরআন এমন এক ঐশী গ্রন্থ যা কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতিকে তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করতে থাকবে। সব সমস্যার সমাধান এই কুরআন মজীদে রয়েছে। মহান আল্লাহ্ তাআলা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানিয়েছেন। মানুষকে তার অধিকার আদায় করার দু'টি পথ দেখিয়ে দিয়েছেন আর তা হল :

(১) **হুক্কুকুল্লাহ্** [আল্লাহ্র প্রাপ্য]

(২) **হুক্কুকুল ই'বাদ** [বান্দার অধিকার]

প্রথম বিষয়টি পুরোপুরি পরিষ্কার কেননা মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন :

“এবং আমি জীন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যে।” [সূরা যারিআত : ৫৬]

সৃষ্টির সেবা এবং আল্লাহ্র অধিকার আদায় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মূলতঃ যে বিষয়টি নিয়ে এখন আলোচনা করব সেটি হল বান্দার অধিকার। আর এরই নাম হল খিদমতে খাল্ক তথা সৃষ্টির সেবা। এখানে প্রধানত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এর সকল সদস্যদের উদ্দেশ্যে খিদমতে খাল্ক সম্বন্ধে যে তাহরীক সমূহ বর্ণনা করেন তা আলোচনা করা হবে।

* ২০০৩ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে হুযূর (আই.) বয়আতের দশটি শর্তের মধ্যে নবম শর্তের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন– আহমদীয়া জামা'তের প্রতিটি সদস্য নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী খিদমতে খাল্ক করে চলেছে। এরপর বলেন :

জামা'তের দৃষ্টিতে সামর্থ্য অনুযায়ী সৃষ্টির সেবা করা হচ্ছে। জামা'তের নিষ্ঠাবান কর্মীদের খোদা তাআলা খিদমতে খাল্ক করার তৌফিক দিয়ে থাকেন। তারা বড় অংকের অর্থও দিয়ে থাকেন যার মাধ্যমে মানুষের সেবা করা হয়। আল্লাহ্ তাআলার ফযলে আফ্রিকা, রাবওয়া এবং কাদিয়ানে জীবন উৎসর্গীকৃত ডাক্তার এবং শিক্ষকগণ সেবা করে যাচ্ছেন। কিন্তু আমি প্রত্যেক আহমদী ডাক্তার, শিক্ষক, উকিল এবং প্রত্যেক সেই সকল আহমদী যারা নিজ নিজ পেশাতে থেকে মানুষের সেবা করতে পারেন, গরীব এবং অসহায় মানুষের কাজে আসতে পারেন তাদেরকে বলছি, তারা যেন অবশ্যই অসহায় এবং দু:স্থ মানুষের সেবা করার চেষ্টা করে। তাহলে আল্লাহ্ তাআলা আপনাদের সম্পদে ও আপনাদের সত্তায় পূর্বের চেয়ে অধিক কল্যাণ দান করবে ইনশাআল্লাহ্। যদি আপনারা এই সেবা এভাবে ধরে নেন যে, আমরা যুগ ইমামের সাথে একটি বয়আতের অঙ্গীকার করেছি আর তা পূর্ণ করা আমাদের ওপর ফরয তাহলে দেখবেন ইনশাআল্লাহ্ তাআলা আল্লাহ্র আশীষ ও কল্যাণের বারিধারা কীরূপে বর্ষিত হয় যা আপনি সামলাতে পারবেন না।” [আল ফযল, ১৩ জানুয়ারী, ২০০৪ইং]

আহমদী ডাক্তারদের ওয়াক্ফ করার তাহরীক :

হুযূর (আই.) ইউ.কে. সালানা জলসা ২০০৩ এর ২য় দিনের বক্তৃতায় বলেন: আফ্রিকাতে আমাদের হাসপাতালগুলোতে ডাক্তারের বড়ই সংকট। আমি আহমদী ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে তাহরীক করছি, তারা যেন নিজেদের উৎসর্গ করার জন্য সঁপে দেন এবং কমপক্ষে তিন বছরের জন্য তা অবশ্যই করে। আর যদি এর চেয়ে বেশী সময় অর্থাৎ ছয় বছর অথবা নয় বছরের জন্য হয় তাহলেতো আরো ভাল। একই ভাবে রাবওয়া'র ফযলে ওমর হাসপাতালের জন্যও ডাক্তারের প্রয়োজন। আহমদী ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে বলব, আজ জামা'তে আহমদীয়া যে ধরনের সেবার পৃষ্ঠপোষকতা করছে সেই সুযোগে আপনারাও ওয়াকফে আরযী করুন। এটি এমন এক সেবা যদ্দারা আপনি জাগতিকভাবে লাভবান হবেন সাথে ধর্মেরও বৃহৎ একটি সেবা হবে। আর এর প্রতিদানকে খোদা আপনার বংশধর পর্যন্ত বিস্তৃত করবেন।” [আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ পৃষ্ঠা-৩]

তারপর ১৭ই অক্টোবর ২০০৩ইং সালের জুমুআর খুতবাতে হুযূর (আই.) বলেন, বর্তমানে অবস্থা একটু ভাল কিন্তু পূর্বে জামা'তের মধ্যে অনেক কষ্ট এবং সমস্যাদি ছিল। এর পরেও যদি এখন কোন রকম কষ্ট থেকেই যায় তবে তা এই বলে মেনে নিতে হবে যে আমি যুগ-ইমামের নিকট বয়আত গ্রহণ করেছি। যেভাবে হোক আমার দায়িত্ব হল, মানুষের সেবা করা। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিক্ষক এবং ডাক্তারের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সকল ডাক্তার ও শিক্ষকদের ওয়াক্ফ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

তাহের হার্ট ইনিষ্টিটিউট এর জন্য তাহরীক :

২০০৫ সালের ৩রা জুন জুমুআর খুতবাতে হুযূর (আই.) বলেন :

আজ আমি একটি তাহরীক করতে চাই

যা বিশেষ করে জামা'তের ডাক্তারগণের উদ্দেশ্যে। এছাড়া জামা'তের সাধারণ সদস্যরাও নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী এই তাহরীকে অংশগ্রহণ করতে পারেন। অঙ্গীকারটি হল তাহের হার্ট ইনিষ্টিটিউট এর জন্য আর্থিক কুরবানীর তাহরীক। চতুর্থ খিলাফতকালের শুরুতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এর একটি ইচ্ছা ছিল যে, এখানে এমন একটি প্রতিষ্ঠান হোক যেখানে হৃদরোগ চিকিৎসার সমস্ত সুযোগ সুবিধা থাকবে। সে সময় এ সম্পর্কে কিছু কথাবার্তাও চলছিল কিন্তু তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। যাই হোক হুযূর (রাহে.) শেষ দিনগুলোতে এর প্রতি আবার দৃষ্টি আরোপ করেন এবং এরই ভিত্তিতে পঞ্চম খিলাফতকালের শুরুতে কার্যক্রম শুরু হয়। আমাদের একজন আহমদী ভাই আছেন যিনি তার পিতা-মাতার পক্ষ থেকে এই প্রতিষ্ঠান নির্মাণের ব্যয়ভারের দায়িত্ব নেন। এরপর আমেরিকার একজন ডাক্তারও এই কাজে অংশগ্রহণ করবেন বলে ইচ্ছা পোষণ করেন। এই প্রতিষ্ঠান তৈরীর জন্য নকশা প্রস্তুত করা হয় এবং সে অনুযায়ী বর্তমানে ছয় তলা বিশিষ্ট মনোমুগ্ধকর একটি প্রতিষ্ঠান তৈরী করা হচ্ছে যা প্রায় সমাপ্তির দিকে। এটি বিভিন্ন দক্ষ ডাক্তারদের পরামর্শ অনুযায়ী সম্পাদিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসার জন্য যাবতীয় সুযোগ সুবিধা সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবস্থাপনা কমিটি একটু চিন্তিত ছিল এর ব্যয়ভার নিয়ে কিন্তু আমি বলি, যে ডিজাইনের প্রতিষ্ঠান আমি মঞ্জুর করেছিলাম তাই বহাল থাকবে। ইনশাআল্লাহ্ খোদা এর মধ্যে বরকত ও কল্যাণ দান করবেন। এরপর ঐ দুই জন আহমদী ভাইয়ের সাথে আরও অনেকে শামিল হন এবং আশা করা যায় কয়েক মাসের মধ্যে এর কাজ সুসম্পন্ন হয়ে যাবে।

ফযলে উমর হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা কমিটি অনেক পরিশ্রম করেন এবং নির্মাণ কাজে যেসব জায়গায় অর্থ বাঁচানোর সম্ভাবনা থাকে সে সব জায়গায় তারা অর্থ বাঁচিয়েছেন এবং নির্মাণ কাজে অনেক সাবধানতা অবলম্বন করেছেন। বিশেষ করে ডাক্তার নুরী সাহেবের কথা বলব, যার টেকনিক্যাল পরামর্শও সর্বক্ষণ আমরা পেয়েছি। আল্লাহ্ তাআলা তাদের সবাইকে উত্তম পুরস্কার দিন। কিন্তু এখন যে সমস্ত যন্ত্রপাতি, আসবাব প্রভৃতি হাসপাতালের জন্য জরুরী তা অনেক মূল্যবান। আমি তাদেরকে বলেছি, যখন যেভাবে অর্থ আসে তখন যন্ত্রপাতিসমূহ ধাপে ধাপে ক্রয় করুন। কিন্তু প্রাথমিক কাজ চালানোর জন্য যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন।

এজন্য আমি আহমদী ডাক্তারদেরকে বিশেষভাবে বলছি, আল্লাহ্ তাআলা আপনাদেরকে অনেক অনুগ্রহ দান করেছেন। প্রধানত যারা আমেরিকা ও ইউরোপ এর ডাক্তারগণ রয়েছেন। একইভাবে পাকিস্তানেও কিছু ডাক্তার রয়েছেন যাদের আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল। যদি আপনারা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং গরীবের সেবা করার জন্য এই হার্ট ইনিষ্টিটিউটকে পূর্ণতাদানের লক্ষ্যে অংশগ্রহণ করেন তবে আপনারাও তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা অসীম পুরস্কার দান করবেন। এই প্রতিষ্ঠান সম্পন্ন করার ব্যাপারে আমারও অনেক ইচ্ছা রয়েছে যেহেতু এটি এই খিলাফতকালে শুরু হয়েছে এবং আমি আশা করি খোদার ফযলে এটির নির্মাণও সম্পন্ন হয়ে যাবে। আল্লাহ্ আপনাদের এই নেক কাজে অংশগ্রহনের সুযোগ দিয়েছেন তাই আপনারা এই নেক কাজে অংশগ্রহণ করুন এবং এই এলাকার অসুস্থ্য এবং দু:খী মানুষের দোয়া নিন। আজকাল হৃদরোগও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর চিকিৎসা এত ব্যয়বহুল যে একজন অস্বচ্ছল লোকের পক্ষে এর ব্যয়ভার বহন সম্ভব নয়। ফলে খোদা প্রদত্ত এই উত্তম সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দুস্থ মানুষদের কাছ থেকে দোয়া গ্রহণ করুন। [আল ফযল, ৬ ডিসেম্বর, ২০০৫]

রোগীদের সেবা শুশ্রূষা করার তাহরীক :

১৫ এপ্রিল ২০০৫ সালের জুমুআর খুতবাতে হুযূর (আই.) রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করার ব্যাপারে বলেন : "রোগীদের সেবা করাও খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের একটি মাধ্যম। এদিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। বিশেষ করে নিম্নোক্ত সংগঠন সমূহকে আমি সর্বদা বলি যে, খিদমতে খাল্‌কের যে সমস্ত ক্ষেত্র রয়েছে সে সমস্ত জায়গায় লাজনা, খোদ্দাম এবং আনসারগণ প্রোগ্রাম বানিয়ে রোগীদের সেবা করুন। হাসপাতালে যান এবং আপন-পর সবার সেবা করুন। এ ব্যাপারে কোন পার্থক্য হওয়া উচিৎ নয়। বরং এটিও একটি সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত এবং আমাদের সর্বদা এই চেষ্টা থাকা উচিত যেন আমরা সবচেয়ে বেশী খোদার নৈকট্য অর্জন করতে পারি।" [আল ফযল, ৮ই নভেম্বর, ২০০৫]

আহমদী ইঞ্জিনিয়ার ও আর্কিটেক্ট ব্যক্তিদের সেবা করার তাহরীক :

হুযূর (আই.) ২০০৪ সালের ৯ই মে "ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব আহমদী আর্কিটেকট্‌স এন্ড ইঞ্জিনিয়ার্স" এর ইউরোপিয়ান চ্যাপ্টার এর সম্মেলন পূর্ব সিমপোজিয়ামে ইঞ্জিনিয়ার এবং আর্কিটেকচারগণকে উদ্দেশ্য করে আফ্রিকাতে বায়তুয্ যিক্‌র, মিশন হাউস, স্কুল, এবং হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য সেবা করার দাওয়াত দেন। তিনি বলেন : প্রত্যেক আহমদী ব্যক্তির মাথায় সব সময় এই চিন্তা রাখা উচিত যে, সে যেন তার সমস্ত সামর্থ্য ও যোগ্যতা জামা'তের উন্নতির পিছনে কাজে লাগায়। আর আমরা যদি নিজেদের ভিতরে এ ধরনের

চিন্তা-চেতনাকে পূর্ণাঙ্গীন রূপদান করতে পারি এবং সে অনুযায়ী প্রত্যেক ইঞ্জিনিয়ার, কম্পিউটার সাইনটিষ্ট, রিসার্চ ওয়ারকার ও ডাক্তার জামা'তের খেদমতের জন্য এগিয়ে আসে তাহলে দেখবেন যে আল্লাহ্ তাআলা আপনাদের ওপর নিজ ফযল বর্ষণ করবেন এবং আপনাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টাতে পূর্বের চেয়ে বেশী বরকত দিবেন।

এখন আমি সংক্ষেপে আপনাদের সামনে একটি খেদমতের কথা বলব যা আমি আফ্রিকার গরীব লোকদেরকেও বলেছি। এই খেদমতের জন্য অনেক দক্ষ সেবক প্রয়োজন। সাম্প্রতিক কালে আফ্রিকাতে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা খুব কঠিন হয়ে পড়েছে। এজন্য স্থানীয় পর্যায়ের কিছু ব্যবস্থাপক, এন,জি,ও বিভিন্ন এলাকাতে হ্যান্ডপাম্প লাগানোর কাজ শুরু করেছে কিন্তু তা দিয়ে সকলের জন্য পানির ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের জামাতেও **"HUMANITY FIRST"** এর মাধ্যমে মানব সেবার কাজে লোকেরা ব্যস্ত রয়েছে। মূল সমস্যা হল আমাদের কারিগরী জ্ঞান কম। আর ড্রিলিং মেশিন না থাকাতে আমাদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা আফ্রিকাতে বসবাসকারী এসব গরীব লোকদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে পারছি না। এই হ্যান্ডপাম্প বসানোর জন্য তারা ৪০০০/- ৫০০০/- পাউন্ড চায় যা পাকিস্তানে বসাতে গেলে বড় জোর ৪০-৫০ পাউন্ড লাগবে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এতো বেশী মূল্য প্রয়োজন হবার কারণ প্রসঙ্গে বলেন, মাটিতে কিছু দূর গর্ত করার পর গ্রাফাইট খন্ড পাওয়া যায় আর এই খন্ডকে গর্ত করতে হলে ডায়মন্ড এর বিট প্রয়োজন হয়, যা খুবই মূল্যবান। কোন কোন সময় তো ডায়মন্ডের একটি বিট দিয়েও গর্ত করা সম্ভব হয় না।

হুযূর বলেন যে, আমার তো টেকনিক্যাল বিষয়ে এতো বেশী জ্ঞান নেই। এগুলো ইঞ্জিনিয়ার এবং জিওলোজিষ্টদের কাজ। আমার এ বিষয়ে এটিই আগ্রহ যে, আফ্রিকার সমস্ত এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা উচিত। আর এই দৃষ্টিকোন থেকে একজন আহমদীরও চিন্তিত হওয়া দরকার। এজন্য আমি 'আর্কিটেক্ট ও ইঞ্জিনিয়ার এসোসিয়েশন' এর ইউরোপীয়ান চ্যাপ্টারকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, আপনারা এই বিষয়ে একটি রিপোর্ট তৈরী করেন যে, কিভাবে আমরা কম খরচে আফ্রিকার এ সমস্ত এলাকায় ড্রিলিং করে অধিক হ্যান্ড-পাম্প স্থাপন করতে পারি।

দ্বিতীয় বিষয় হল, এ সমস্ত দেশের জামা'ত বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরী করছে যেমন : মিশন হাউস, স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতি। আমি আহমদী ইঞ্জিনিয়ার ও আর্কিটেক্টগণকে এ সমস্ত দেশে যাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি এবং আমার ধারনা অনেকে নিজ খরচে এ সমস্ত জায়গায় যাবার সামর্থ্য রাখেন। এমন অনেক দেশ আছে যেখানে কোন ইঞ্জিনিয়ার এবং কোন আর্কিটেক্ট-ই নেই যারা পরামর্শ দিবে যে, কি ধরনের প্রতিষ্ঠান তৈরী করা উচিত যাতে খরচ কম হয় এবং প্রতিষ্ঠানটিও ভাল হয়। আমি আশা করি ইঞ্জিনিয়ার এবং আর্কিটেক্টগণ ওসব জায়গায় ওয়াকফে আরজীতে যাবেন এবং আমাদেরকে পরামর্শ দিবেন কিভাবে কম খরচে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান তৈরী করা যাবে ও একই সাথে তা আকর্ষণীয় হবে।

একই সাথে ইউরোপে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও ডিজাইন করার জন্য আপনাদের সাহায্য প্রয়োজন। সম্মানিত আহমদী ব্যক্তিবর্গ এবং এসোসিয়েশন এর সদস্যগণও এ কাজে তাদের প্রচেষ্টার স্বাক্ষর রেখেছেন। আমি আশা করি তারা ভবিষ্যতেও এই প্রচেষ্টা বহাল রাখবেন। এখন আমি আপনাদেরকে আফ্রিকাতে নির্মাণাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে দৃষ্টি দেবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

এরই সাথে হুযূর (আই.) আফ্রিকাতে বিদ্যুৎ সমস্যার কথাও বলেন এবং ইঞ্জিনিয়ারদের আহ্বান জানান সৌরশক্তি দিয়ে কিভাবে এর সমাধান করা যায়। [আল ফযল, ৩০ জুন, ২০০৪]

এরপর হুযূর (আই.) ইউ.কে. সালানা জলসা ২০০৬ তে আহমদী ইঞ্জিনিয়ারদের খেদমত করার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, আমি 'ইন্টারন্যাশনাল আহমদী এসোসিয়েশন অব আর্কিটেকটস্ এ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারস্" এর দায়িত্বে কিছু কাজ দিয়েছিলাম। এরই ভিত্তিতে তারা চীন থেকে টেকনোলজি সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করে এবং ৩০ টি সোলার সিস্টেম কিনে নিয়ে আসে। যথেষ্ট পরিমাণ সৌর বাল্ব ক্রয় করে আনা হয়। এছাড়া অষ্ট্রেলিয়া থেকেও অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ঘানাতে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহার্থে ড্রিলিং এবং জিওফিজিকাল টেস্টিং প্রভৃতি কাজ করে। বুর্কিনাফাসোতে কিছু লাগানো হয়। কানাডার ইঞ্জিনিয়ারদের একটি দলও এই কাজে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া হল্যান্ড, স্পেন, সুইজারল্যান্ড, পর্তুগাল, নরওয়ে প্রভৃতি স্থানে জামা'ত প্রতিষ্ঠার সময়ও তারা অনেক খেদমত করেন। আবার গাম্বিয়া ও আইভরীকোষ্ট এ প্রজেক্টেও তারা কাজ করেন। কাদিয়ানের বেহেশতি মাকবেরার সাথে সম্পর্কিত কাজও করে চলেছেন। এভাবে মিনারাতুল মসীহ্ এর সংরক্ষণের জন্যেও এখানকার ইনিঞ্জনিয়ারগণ কাজ করেছেন। [আল ফযল, ৪ আগষ্ট, ২০০৬]

২০০৩ সালে যখন ইরানে ভূমিকম্প হয়েছিল সে সময় জামা'তকে সেবা করার কথা বলতে গিয়ে কাদিয়ান সালানা জলসা '০৩ এর সমাপ্তি অধিবেশনে হুযূর (আই.) বর্ণনা করেন, বিগত দিনগুলোতে ইরানে ভয়ানক

ভূমিকম্পের ফলে অসংখ্য ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। সহানুভূতি হল এই যে, তাদের জন্য দোয়া করা এবং আর্থিক সাহায্য করা। সকলেই এই বিপদগ্রস্থ মানুষদের সাহায্য করার চেষ্টা করুন। [বদর. ২৭ জানুয়ারী, ২০০৪ পৃষ্ঠা ০২]

সুনামী আক্রান্তদের জন্য রিলিফ ফান্ডের তাহরীক :

২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ প্রান্তের দেশগুলো তথা সুমাত্রা, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশীয়া, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ এবং ভারতসহ ২০০০ কিলোমিটারেরও বেশী এলাকা জুড়ে অত্যধিক উচ্চতা বিশিষ্ট ভয়ঙ্কর সামুদ্রিক ভূমিকম্পে আক্রান্ত হয় এবং সুনামির ভয়ঙ্কর ঢেউ নিমিষেই ২ লাখেরও বেশী মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ইমাম সৈয়্যদেনা হযরত আমীরুল মু'মি-নীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) জামা'তের নিষ্ঠাবান সদস্যদেরকে আহ্বান জানান যেন অসহায় এবং বিপদগ্রস্থ মানুষদের সেবায় রিলিফ ফান্ড সরবরাহ করা হয়। এই দুর্যোগের সময় জামা'তের সেবা কিরূপ ছিল তার বর্ণনায় হুযুর (আই.) বলেন, "জামা'তের একটি প্রতিষ্ঠান হল **'হিউমেনিটি ফার্ষ্ট'**। আর এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে বিভিন্ন দেশকে এই সেবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। এরই অধীনে থেকে জার্মানী এবং ভারত মিলে ভারতে আক্রান্তদের সেবা করেছে। ইতোমধ্যে সাড়ে চার হাজারের কাছাকাছি রোগীর সেবা হয়ে গেছে। আবার প্রায় সাড়ে তিন হাজার লোক এমন ছিল যাদের খাদ্যের প্রয়োজন ছিল এবং তাদেরকে খাবার দেয়া হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন দেশ এ কাজে বিপুল সহযোগিতা করেছে।"

আযাদ কাশ্মীরের ভূমিকম্পগ্রস্থদের জন্য তাহরীক ;

২০০৫ সালের ৮ই অক্টোবর তারিখে পাকিস্তান এবং আযাদ কাশ্মীরে ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্প সংঘটিত হয় যাতে লক্ষাধিক লোক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাদের সাহায্যের জন্য হুযূর (আই.) ১৪ অক্টোবর ২০০৫ সালের জুমুআর খুতবাতে তাহরীক করে বলেন : "এই ভূমিকম্পের পর অন্যান্য জামা'ত এবং পাকিস্তান জামা'তের সদস্যারও নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্য করছে। এরপরও আমি পাকিস্তানী আহমদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যারা ঘরছাড়া হয়েছে এবং খোলা আকাশের নীচে অবস্থান করছে তাদেরকে যতদূর সম্ভব সাহায্য করুন। যেসব পাকিস্তানী আহমদীগণ দেশের বাইরে বাস করেন তারাও রিলিফের কাজে পাকিস্তান সরকারের সাহায্য করুন। বিদেশে পাকিস্তানের রষ্ট্রদূতগণ যেসব ফান্ড খুলেছেন এবং যেসব স্থানে হিউমেনিটি ফার্স্ট নেই সেখানে গিয়ে সাহায্য করতে পারেন। [খুতবাতে মাসরূর, অধ্যায়-৩, পৃষ্ঠা -৬১২]

এতিমদের প্রতি সেবার তাহরীক :

২৩ জানুয়ারী, ২০০৪ সালের জুমুআর খুতবাতে হুযূর (আই.) বলেন : "আল্লাহ্ তাআলার ফযলে জামা'তের মধ্যে এতীমদের দেখাশোনা করার খুব ভাল ব্যবস্থাপনা রয়েছে। কেন্দ্রীয় পর্যায়েও ব্যবস্থাপনা চালু রয়েছে। যদিও এর নাম "একশত এতীমদের তাহরীক" তবুও এখানে সহস্রাধিক এতীম পড়ালেখা সম্পন্ন করে প্রাপ্ত বয়স্ক হবার পর জীবিকা নির্বাহ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গীন দেখাশোনা করা হয়। এভাবে মেয়েদেরকেও বিবাহ দেবার যাবতীয় খরচ জামা'তই বহন করে এবং আজ পর্যন্ত চলে আসছে। আল্লাহ্ তাআলার ফযলে জামা'ত এ ব্যাপারে অত্যন্ত উদার এবং জামা'তের প্রতি যারা নিবেদিত প্রাণ তারাই এ অর্থ ব্যয় করে থাকেন। আলহামদুলিল্লাহ্, জাযাকুমুল্লাহ্, তাদের সকলের প্রতি শুকরিয়া। এখন আমি দুনিয়ার অন্যান্য দেশের লোকদের বলছি, নিজেদের দেশের এমন এতীমদের তালিকা তৈরী করুন যারা আর্থিক ভাবে দুর্বল, পড়াশুনা করতে পারছে না, খাওয়া-দাওয়ার খরচ চালানো কষ্টকর। এরপর আমাকে অবগত করুন, বিশেষ করে আফ্রিকান দেশগুলোতে, এভাবে বাংলাদেশ এবং হিন্দুস্থানেও এমন দরিদ্র রয়েছে। এগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। নিয়মিত একটি স্কীম বানিয়ে সে অনুযায়ী কাজ শুরু করুন। আমার আশা আছে যে, জামা'তের যারা বিত্তবান লোক রয়েছেন তারা একাজে অংশগ্রহণ করবেন এবং ইনশাআল্লাহ্ এসব এতীমদের দেখাশোনার জন্য কখনও আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতে হবে না। কিন্তু জামা'তের কর্মকর্তাদের এটি চেষ্টা করা প্রয়োজন যেন তিন মাসের মধ্যে এই তালিকা বিস্তারিতভাবে আমার কাছে চলে আসে। আল্লাহ্ তাআলা তাদের সবাইকে তৌফিক দিন এবং আমাদেরকেও এতীমদের হক্ আদায় করার তৌফিক দিন। [আল ফযল, ১৯ নভেম্বর, ২০০৪ইং]

গরীব সন্তানদের বিয়েতে সাহায্য করার তাহরীক :

হুযূর (আই.) বিয়ে শাদীতে অতিরিক্ত খরচ করতে নিষেধ করেন এবং বলেন যে, এর পরিবর্তে গরীব বাচ্চাদের বিয়ের জন্যও যেন কিছু অর্থ জমা করা হয়। এ প্রসঙ্গে ৩ জুন ২০০৫ সালের জুমুআর খুতবাতে বলেন : "যারা বিদেশে রয়েছেন তারা তাদের বাচ্চাদের বিয়েতে অতিরিক্ত খরচ করে থাকেন। যদি এরই সাথে তারা পাকিস্তান, হিন্দুস্থান এবং অন্যান্য গরীব দেশের গরীব সন্তানদের বিয়ের জন্য কিছু অর্থ নির্দিষ্ট করে রাখেন তবে তা এমন একটি সদকায়ে জারিয়াহ্ হত যা তাদের সন্তানের জন্যও খুশীর কারণ হত। আল্লাহ্ কখনও পুণ্যকে নষ্ট করেন না। এমনও অনেক সাহেবগণ রয়েছেন যারা লোকদের দেখিয়ে অনেক অর্থ খরচ করেন। অনেক রকমের খাবারের আয়োজন করেন যার বেশীর ভাগই নষ্ট হয়। এখান থেকে বিশেষ করে যখন পাকিস্তানে গিয়ে বিয়ে করেন তখন যদি অত্যন্ত সাদামাটা ভাবে বিয়ে করেন এবং টাকা বাঁচিয়ে কোন গরীব বাচ্চার বিয়েতে দেন তাহলে খোদার সন্তুষ্টি অর্জন হবে।

খাবার ছাড়াও বিয়ের কার্ড ছাপাতেও অতিরিক্ত খরচ করা হয়। পাকিস্তানে

দাওয়াত কার্ড এক রুপি দিয়ে ছাপানো যায়। এখানে একদম সাধারণ কার্ডও পাঁচ-সাত পেনস দিয়ে ছাপাতে হয়। কার্ডের মাধ্যমে তো দাওয়াত দেয়াই মূল উদ্দেশ্য, এখানে বাহ্যিক চাকচিক্যের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু বিনা কারণে অত্যন্ত দামী দামী কার্ড ছাপানো হয়। আর জিজ্ঞাসা করলে বলে, কই! এতো অনেক সস্তা, মাত্র পঞ্চাশ রুপি মূল্য। এখন এই মাত্র পঞ্চাশ রুপির কার্ড যদি পাঁচশত ছাপানো হয় তবে পাকিস্তানে এর মূল্য পঁচিশ হাজার দাঁড়ায়। এই পঁচিশ হাজার রুপি যদি কোন গরীবের বিয়েতে দেয়া হয় তবে তার আর খুশীর ও শুকরিয়া আদায়ের সীমা থাকবে না। এভাবে অগণিত স্থানে অযথা খরচ করা হচ্ছে। এবং যাদের এতোটা সামর্থ রয়েছে যে তারা বলে আমরা গরীব বাচ্চাদের বিয়েতেও অংশ নিতে পারি কিন্তু এর জন্য এরকম ক্ষুদ্র অর্থ বাঁচানোর কোন প্রয়োজন নেই তাহলে তো **ঐ সমস্ত লোকদের কমপক্ষে যা তারা তাদের নিজেদের সন্তানদের বিয়েতে খরচ করছে তার এক শতাংশ গরীব বাচ্চাদের বিয়েতে চাঁদা হিসেবে দেয়া উচিত।** পাকিস্তানেও এমন অনেক লোক রয়েছে যারা বাড়তি খরচ করে। এমনও লোক আছে যারা বাহির থেকে গিয়ে দেশে খরচ করছেন এবং কেউ কেউ আছেন যারা দেশে থেকেই বেশি খরচ করছেন। এছাড়া যারা বাড়তি খরচ মোটেও করে না তাদের তো গরীব বাচ্চাদের বিয়েতে এগিয়ে আসা উচিত এবং এই পুণ্যকর্মে অংশগ্রহণ করা উচিত। সাধারণত একজন গরীব বাচ্চার বিয়েতে ২৫-৩০ হাজার রুপি দিয়ে সাহায্য করা হলে সে বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। এতে গরীব লোকটির জন্যও শান্তির কারণ হবে আবার সাথে সাথে আপনিও দোয়ার উত্তরসূরী হয়ে যাবেন। সর্বোপরি প্রত্যেককে তাদের সামর্থানুযায়ী এই ফান্ডে অংশগ্রহণ করা উচিত। আল্লাহ্ তাআলা সবাইকে এর তৌফিক দিন।"

আমাদের জামা'তে এজন্য অনেক পূর্ব হতেই **'মরিয়ম শাদী ফান্ড'** প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। হুযূর (আই.) এই ফান্ডে সকলকে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন : "আমি আরও কিছু তাহরীক করতে চাই যেগুলোর দিকে আপনাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি–একটি হল 'মরিয়ম শাদী ফান্ড' যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এর সর্বশেষ তাহরীক ছিল। আল্লাহ্ তাআলার ফযলে এই ফান্ড অনেক বরকতমন্ডিত হয়েছে। অনেক ছেলেমেয়েদের বিয়ে এই ফান্ড থেকে সম্পন্ন হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। জামা'তের অনেক নিষ্ঠাবান সদস্য এই ফান্ডে অংশগ্রহণ করছেন। আমি মূলত: আপনাদেরকে এটি বুঝাচ্ছি যে প্রথম দিকে মানুষ যতটুকু গুরুত্বের সাথে এটিকে দেখেছিল বর্তমানে সে অবস্থা নেই। এমন অনেক বিত্তবান আহমদীরা জানেনই না যে একজন গরীব লোকের সন্তানদের বিয়েতে কত সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে।" [আল ফযল, ৬ ডিসেম্বর, ২০০5]

জামা'তের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের প্রথমেও একবার বলেছি এখন আবার বলছি এবং দ্বিতীয়বার তাহরীক করছি আপনারা অবশ্যই মরিয়ম শাদী ফান্ডে অংশগ্রহণ করুন এবং যখন আপনাদের নিজেদের সন্তানদের বিয়ে হবে তখন এটি দৃষ্টিপটে রাখুন যে এর সাথে একজন গরীব ব্যক্তির সন্তানের বিয়েও করাতে হবে।" [আল ফযল, ২৮ মে, ২০০৫]

হুযূর (আই.) ৩১ মার্চ ২০০৬ সালের জুমুআর খুতবাতে বলেন : "এই কিছুদিন হল জার্মানীর একজন যুবকের ব্যাপারে আমি জানলাম সে ঋণী ছিল এবং তার বিয়েরও আয়োজন ছিল। সে খুব অল্প অর্থই জমা করেছিল কিন্তু যখন জানতে পারল যে সেখানে একশ জনের চাঁদার তাহরীক করা হয়েছে তখন সে তার নিজের বিয়ের জন্য জমাকৃত সকল অর্থ এনে জামা'তের খেদমতে পেশ করে।" [আল ফযল, ২৫ এপ্রিল, ২০০০৬]

বায়তুল হামদ্ স্কীম-এ অংশগ্রহণের তাহরীক :

হুযূর (আই.) ১৩ অক্টোবর ২০০৭ সালের ঈদুল ফিতর এর খুতবাতে বলেন : আবার "বায়তুল হামদ্" স্কীম রয়েছে। এটিও খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এর একটি তাহরীক ছিল। প্রথম উদ্দেশ্য ছিল যে রাবওয়াতে একশ ঘর বানিয়ে গরীব এবং অভাবীদের দেওয়া এবং আল্লাহ্র ফযলে তা পূর্ণ হয়ে গেছে। এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে লোকদের ঘর বৃদ্ধি করা এবং প্রয়োজন মত কক্ষ বানিয়ে দেয়া হয়েছে। কাদিয়ানেও বায়তুল হামদ্ ফান্ডের অধীনে অনেক ঘর বানানো হয় এবং পাকিস্তানে ও অন্যান্য দেশে বিল্ডিং পর্যন্ত বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিসীম প্রয়োজন যার দিকে আহমদীদের দৃষ্টি দেয়া উচিত। যখন কোন আহমদী আল্লাহ্র কৃপায় বাড়ী তৈরী করেন তখন তাদের একজন গরীব ভাইয়ের প্রতিও দৃষ্টি দেয়া উচিত। এভাবে দুনিয়ার সকল আহমদী যদি অল্প কিছু করে হলেও এই ফান্ডে অংশগ্রহণ করেন তাহলে অনেকগুলো ঘর বানানো সম্ভব হবে। ফলে কিছু অভাবী-গরীব ভাইয়ের উপকার হবে।"

এতক্ষণ আপনারা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর হুকুকুল ইবাদ (বান্দার অধিকার) সম্পর্কে বেশ কিছু তাহরীক এর কথা জানতে পারলেন। মূলত: খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য খোদার ইবাদত যেভাবে করা বাধ্যতামূলক সেভাবে তাঁর বান্দাদেরও অধিকার আদায় করা কর্তব্য। আর এজন্যে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন : এবং তোমরা পুণ্য কাজে এবং তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনে পরস্পর সহযোগিতা করো না।" [আল মায়েদা : ৩]

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে বেশী বেশী পুণ্যকর্ম করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

(দৈনিক আল ফযল অবলম্বনে)

অনুবাদ : **মামুন উর রশিদ**
ছাত্র, ৪র্থ বর্ষ
জামেয়া আহমীয়া, বাংলাদেশ।

আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার দৃষ্টিতে নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার

পারিবারিক জীবনে নারী ও শিশুদের সাথে সম্পর্ক বজায় এবং সুখী দাম্পত্যময় জীবন গড়ার ক্ষেত্রে মানুষ প্রায়াই ভুল করে বসে এবং সহজ সরল পথ অবলম্বন করা থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। পবিত্র কুরআন শরীফে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও এখন এর বিপরীত কার্য করা হচ্ছে। এরূপ দুই ধরনের লোক পাওয়া যায়। একদলতো স্ত্রীদেরকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেছে। তাদের ওপরে ধর্মের কোন প্রভাব নেই নিজেদের কর্তৃত্ব নেই। তারা প্রকাশ্য নানা অশালীন কর্ম করে থাকে আর কেউই এ ব্যাপারে তাদের জিজ্ঞেস করে না। আবার অনেকে এমন আছে যারা স্ত্রীদের স্বধীনতা প্রদানের বিপরীতে তাদের সাথে এতো নির্দয় ও কঠোর আচরণ করে যাতে করে তার মাঝে এবং পশুর মাঝে কোন পার্থক্য থাকে না। তারা স্ত্রীদের সাথে ক্রীতদাসী এবং চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় আচরণ করে। পাঞ্জাবে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, যেখানে মহিলাদেরকে জুতার সাথে তুলনা করা হয়েছে : যেমন নারীদেরকে উদ্দেশ্যে করে বলে থাকে 'একটি ছুড়ে ফেলে দাও আরেকটি পরে নাও'। এটা অত্যন্ত ভয়ানক এবং সম্পূর্ণ বিবেক বর্জিত কথা। সকল কথার সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হলো আমাদের রাসূলুল্লাহ্ (সা.)। আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র জীবনের দিকে দৃষ্টি দাও। তিনি (সা.) স্ত্রীদের সাথে কিরূপ জীবন যাপন করেছেন! তিনি (সা.) বলেন, আমার নিকট সে ব্যক্তি ভীতু ও কাপুরুষ যে নারীর মোকাবেলায় দন্ডায়মান হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দিকে লক্ষ্য কর সেখানে তোমরা জানতে পারবে হুযূর (সা.) কত ভদ্র ও নম্র ছিলেন। তাঁর চেহারার মাঝে অদ্ভুত এক প্রভাব ছিল। যদি কোন অবলা নারী হুযূর (সা.)-এর সাক্ষাৎ লাভের জন্য অবস্থান করতো তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই মহিলা যাওয়ার অনুমতি না দিতো। তিনি (সা.) দাঁড়িয়েই থাকতেন। (মলফুযাত, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৮৭)

"এটা মনে করো না নারী এমন এক জিনিস যে তাদেরকে যত ইচ্ছা অপমান-অপদস্থ করা যাবে। কখনোই নয়! কখনোই নয়! আমাদের পরিপূর্ণ পথ প্রদর্শক হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করে। স্ত্রীর সাথে যার চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, জীবন-যাপন ভাল নয় সে কি করে নেক মানুষ হতে পারে? অন্যের সাথে সে তখনই ভাল ও উত্তম আচরণ করতে পারবে যখন সে তার নিজ স্ত্রীর সাথে সামান্য কথাতেই ঝগড়া-বিবাদ, মারামারির পরিবর্তে উত্তম আচরণ এবং সুখী দাম্পত্য জীবন-যাপন অতিবাহিত করবে। এমন অনেক ঘটনা ঘটে, অনেক সময় স্বামী স্ত্রীর সাথে সামান্য কথাতেই অসন্তুষ্ট হয়ে উগ্রতা প্রকাশ পূর্বক স্ত্রীকে প্রচন্ড ভাবে প্রহার করে, স্পর্শকাতর কোন জায়গায় আঘাত লাগার কারণে সে মারাও যেতে পারে। তাই আল্লাহ্ তাআলা যেই সকল স্বামীদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "আ'শিরুহুন্না বিল মা'রুফি" অর্থাৎ তাদের সাথে উত্তম ভাবে জীবন-যাপন কর। হ্যাঁ! যদি তারা কোন অশোভোনীয় কাজ করে তাহলে তাদেরকে তীরস্কার ও সতর্ক করে দেয়া প্রয়োজন। স্বামীদের উচিত একথা তাদের স্ত্রীদের হৃদয়ে ভালভাবে প্রোথিত করে দেয়া, তোমাদের ধর্ম বিরুদ্ধ কোন কাজ কখনো প্রশ্রয় দেয়া হবে না। সেই সাথে এটাও বলে দেয়া, সে এরূপ অবিবেচক ও উৎপীড়ক নয় যে, তার কোন ভুলকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে না।

স্বামী, স্ত্রীর জন্য আল্লাহ্ তাআলার দর্পনস্বরূপ হয়ে থাকে। হাদীস শরীফে এসেছে, আল্লাহ্ তাআলা যদি তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদা করার আদেশ দিতেন, তাহলে নারীদেরকে তাদের স্বামীকে সেজদা করার আদেশ দিতেন। সুতরাং পুরুষের মাঝে প্রতাপ ও কঠোরতার পাশাপাশি সৌন্দর্য ও ভালবাসা উপস্থিত থাকা আবশ্যক। (মলফুযাত, ১ম খন্ড, পৃ. ৩০৩)

অশ্লীলতা এবং বেহায়াপনা ব্যতীত নারীদের অন্য সকল বক্র আচরণ সহ্য করা উচিত। পুরুষ হয়ে নারীদের সাথে লড়াই করা এটা ভাবতে গেলেইতো আমরা চরমভাবে লজ্জিত হই। খোদা তাআলা আমাদেরকে পুরুষ বানিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদেরকে তাঁর সকল পরিপূর্ণ নেয়ামত প্রদান করেছেন। তাই এ সকল নেয়ামতের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমরা যেন আমাদের স্ত্রীদের সাথে দয়া, নম্রতা এবং শিষ্টাচারপূর্ণ আচরণ করি।

(মলফুযাত, ২য় খন্ড, পৃ. ৩০৭) [আল ফযল, ২৪ জানুয়ারী, ২০০৮]

(দৈনিক আল ফযল অবলম্বনে)

অনুবাদ : আহমদ জাকির হোসেন
ছাত্র, ৪র্থ বর্ষ
জামেয়া আহমীয়া, বাংলাদেশ।

তাহাজ্জুদে ওঠার জন্য তেরটি পদ্ধতি

সৈয়্যদনা হযরত বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ১৯১৬ সালে অনুষ্ঠিত জলসা সালানায় "যিকরে এলাহী" বিষয়ে প্রদত্ত বক্তৃতায় তাহাজ্জুদ নামায পড়ার ব্যাপারে কিরূপে রাত্রি বেলায় নিদ্রা থেকে ওঠে নামায আদায় করতে হবে এ সম্পর্কে ১৩টি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন।

এ পদ্ধতিগুলো হুযূর (রা.)-এর ভাষায় সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হল : হুযূর (রা.) বলেন, আমার দৃষ্টিতে ১৩টি পদ্ধতি রয়েছে যা মানুষকে রাতের বেলায় জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি এর ওপর আমল করে তাহলে আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় অবশ্যই সে সফলকাম হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে তো সকল কাজেই সমস্যা হয়। কিন্তু পরিশেষে অবশ্যই সফলতা আসে। এই সকল কথা যা আমি বর্ণনা করব তা কুরআন ও হাদীস থেকেই চয়নকৃত নিজের পক্ষ থেকে নয়।

খোদা তাআলার এটি বিশেষ অনুগ্রহ যে এই সকল সূক্ষ্ম তত্ত্বপূর্ণ কথা বিবেচনার দ্বার কেবলমাত্র আমার ওপরই উন্মোচিত হয়েছে। এ বিষয়টি অন্যদের নিকট সম্পূর্ণ লুক্কায়িত। যদি সময় সংক্ষিপ্ত না হত

তাহলে আমি কুরআন করীমের সেই সকল আয়াত ও হাদীস বর্ণনা করতাম যা আমি সংগ্রহ করে এনেছি কিন্তু এখন কেবল বিষয়টির ফলাফল বর্ণনা করব।

১। প্রথম পদ্ধতি হল, আল্লাহ্ তাআলা প্রকৃতির মাঝে এই বিধান রেখেছেন, যে নির্দিষ্ট সময়ে কোন জিনিসের সৃষ্টি হয়-ঐ একই সময় যখন পুণর্বার আসে তখন সেই জিনিসের মাঝে নতুন করে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়ে যায়। এ সম্পর্কে অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ শৈশবে মানুষ যদি কোন রোগে আক্রান্ত হয় তখন দেখা যায় বৃদ্ধাবস্থায়ও সেই রোগের লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে। এই বিষয়টি বৃক্ষরাজী ও পক্ষীকূলের মাঝেও পাওয়া যায়।

এ পদ্ধতি অনুযায়ী রাতে উঠার জন্য সহায়ক রূপে কাজ করবে যে বিষয়টি তা হল–

(১) এশার নামায আদায় করার পর কিছুক্ষণ যিকরে ইলাহী করুন। এর ফলাফল এই হবে যে, যতক্ষণ সময় সে খোদাকে স্মরণ করবে ভোরবেলা ততপূর্বেই খোদাকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে তার ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

(২) দ্বিতীয় পদ্ধতি হল–এশার নামায পড়ার পর কারো সাথে (অযথা ও অপ্রয়োজনীয়) কোন কথা বলবে না। রাসূল করীম (সা.) এশার নামাযের পর (অতিরিক্ত) কোন কথা বলতে বারণ করেছেন। যদিও এটি প্রমাণিত যে অনেক সময় তিনি (সা.)ও কথা বলতেন কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে তিনি এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।

(৩) তৃতীয় পদ্ধতি হল– যদি কোন ব্যক্তি এশার নামাযের পর বিছানায় ঘুমানোর জন্য যায় আর যদিও সে সময় তার ওযু থাকে তবুও সে যেন নতুন করে ওযু করে নেয়। এতে করে হৃদয়ের মাঝে এক বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি হয় এবং এক প্রকারের প্রফুল্লতা জন্ম লাভ করে।

(৪) চতুর্থ পদ্ধতি হল–যখন বিছানায় ঘুমানোর জন্য যাবেন তখন যেন কোন দোয়া করে ঘুমান, ফলে রাতে দোয়া করার কারণে পরবর্তীতে তার ঘুম ভেঙ্গে যাবে। আঁ হযরত (সা.) রাতে শোয়ার পূর্বে এরূপ দোয়া করতেন।

(৫) পঞ্চম পদ্ধতি হল–শোবার সময় মনে মনে দৃঢ়সংকল্প করে নেয়া যে অবশ্যই আমি তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠব। মানুষের অভ্যন্তরে আল্লাহ্ তাআলা এমন শক্তি রেখেছেন যে, যখন সে তার আত্মাকে কোন বিষয়ে বাধ্য করে যে অবশ্যই এ কাজ করবে, অবশেষে দেখা যায় সে তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

(৬) ৬ষ্ঠ পদ্ধতি হল যেভাবে যা করার অনুমতি শুধুমাত্র সেভাবেই তা করবে। যার ফলে ঈমান অত্যন্ত দৃঢ় সে বেতের নামায এশার নামাযের সাথে পড়ে না বরং তাহাজ্জুদের সময় পড়ার জন্য রেখে দেয়। সাধারণত এই বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় যে, মানুষ ফরযকে বিশেষভাবে আদায় করে কিন্তু নফল আদায়ে অলসতা প্রদর্শন করে। অতএব যখন নফলের সাথে ওয়াজীব সংযুক্ত হয় তখন তার আত্মা কখনও আরাম করবে না যতক্ষণ না সে বেতের নামায আদায় করে। এর ফলে তার আত্মার মাঝে অলসতার বীজ কখনো দানা বাধবে না।

(৭) সপ্তম পদ্ধতি হল–এ পদ্ধতি তাদের জন্য যারা আধ্যাত্মিকতায় অনেক উচ্চ পর্যায়ে আছে, সে ব্যক্তি এশার নামাযের পর থেকেই নফল নামায পড়া শুরু করে দেয়। এত দীর্ঘ নামায পড়ে যাতে নামাযেই ঘুম চলে আসে আর এত ঘুম আসে যে সহ্য করা যায় না তখন ঘুমাতে যায়। দেরী করে ঘুমাতে যাওয়ার ফলে যদি সময় বেশি লেগে যায় তবুও সকাল-সকাল তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। এটি এক প্রকার আধ্যাত্মিক ব্যায়াম।

(৮) অষ্টম পদ্ধতি হল–সে বিষয়টি আমাদের সুফীদের মাঝে যার প্রচলন ছিল আমি এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি না, কিন্তু এর উপকারিতা হল যেই দিনগুলিতে ঘুম বেশি আসে এবং যথাসময়ে ঘুম ভাঙ্গে না তখন সেই সময়ে নরম বিছানা পরিহার করা উচিত।

(৯) নবম পদ্ধতি হল– এই যে, রাতে শোবার কয়েক ঘন্টা পূর্বে খাবার খেয়ে নেয়া। অর্থাৎ মাগরিবের নামাযের পূর্বে বা পরে অত্যন্ত দ্রুত খাবারের কাজ শেষ করা। অনেক সময় এরূপ হয় যে, মনের অবস্থা দৃঢ় থাকে কিন্তু দেহ তাকে অলস করে দেয়।

(১০) দশম পদ্ধতি এই যে– যখন মানুষ রাতের বেলায় ঘুমায় তখন তার অবস্থা এমন যেন না হয় যে তার স্বপ্নদোষ হয়েছে অথবা কোন অপবিত্রতা তাকে স্পর্শ করেছে। মূলকথা পবিত্রতার সাথে ফিরিশ্তাদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে আর ফেরেশ্তারা অপবিত্র ব্যক্তির কাছে আসে না। বরং তার থেকে দূরে সরে যায়। তাই রাসূল করীম (সা.) এর সামনে যখন একটি দুর্গন্ধযুক্ত জিনিষ খাবারের জন্য আনা হল তখন তিনি (সা.) সাহাবীকে বললেন তুমি খেয়ে নাও আমি খাব না। সাহাবী বলল আমিও খাব না। তখন তিনি (সা.) বললেন তুমি খেয়ে নাও আমার সাথে তো ফিরিশ্তা কথা বলে এই জন্যই আমি খাবনা, কেননা ফিরিশ্তার কাছে এমন জিনিস অপছন্দনীয়।

(১১)। একাদশ পদ্ধতি এই যে– বিছানা যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়। অনেক লোক এই বিষয়ে গুরুত্ব দেয় না কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে বিছানার পবিত্রতা আধ্যাত্মিকতার সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখে আর এ কারণেই এর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া উচিত।

১২। দ্বাদশ পদ্ধতি – তাহাজ্জুদ নামায পড়ার সুবিধার্থে স্বামী-স্ত্রী যেন এক বিছানায় না ঘুমান।

১৩। ত্রয়োদশ পদ্ধতি এরূপ উন্নততর যা শুধু তাহাজ্জুদে উঠার জন্যই সহায়ক নয় বরং এতে আমল করার মাধ্যমে মানুষ অনিষ্ট ও মন্দ থেকে বেঁচে যায় আর তা হলো– ঘুমানোর পূর্বে এটি দেখা উচিত যে আমাদের মনে কারো সম্পর্কে কোন বিদ্বেষ বা শত্রুতা নেই তো, আর যদি থেকে থাকে তাহলে তা মন থেকে বের করে দেয়া উচিত। (আনওয়ারুল উলুম, যিকরে ইলাহী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫১১-৫১৬)

[মাসিক আনসারুল্লাহ্, নভেম্বর-২০০৫ অবলম্বনে]

অনুবাদ : **নাবিদ আহমদ লিমন**
ছাত্র, ৩য় বর্ষ
জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

জামা'ত ও অংগসংগঠনসমূহে কর্মতৎপরতার সংবাদ

তরবিয়তী সেমিনার

গত ২১/১১/২০০৯ইং তারিখ রোজ শনিবার বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, শৈলমারী মসজিদে জনাব নূরুল ইসলাম সাহেবের সভাপতিত্বে এক বিশেষ তরবিয়তী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব তরীকুল ইসলাম। মসজিদ ও নামাযের মাধ্যমে হেফাযত বিষয়ে আলোচনা করেন জেলা কায়েদ জনাব তারেক আহমদ। নও মোবাঈনদের জন্য জরুরী বিষয়ে আলোচনা করেন স্থানীয় যয়ীম আনসারুল্লাহ্। আনুগত্য, খিলাফতের সাথে অটুট ভালবাসা, ধর্মের জন্য সকল কিছুর কুরবানী ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন মৌ. মোজাফফর আহমদ সাহেব। পরিশেষে সভাপতি সাহেব সকলকে জামা'তের একনিষ্ঠ কর্মি হওয়ার আহ্বান জানিয়ে ও দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

সাব্বির আহমদ

পুস্তক সেমিনার

গত ২৭/১১/২০০৯ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, উথলী ও মজলিসে আনসারুল্লাহ্ উথলীর যৌথ উদ্যোগে উথলী মসজিদে জনাব রিজিওনাল নাযেম সাহেবের সভাপতিত্বে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর লিখিত কিতাব 'ইসলাম' এর উপরে এক বিশেষ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন স্থানীয় যয়ীম আনসারুল্লাহ্ উথলী। উক্ত কিতাবের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব রাজিব মাহমুদ, কায়েদ উথলী, খাকসার, জনাব তাহের খালিদ রুমি, জনাব শাহিনুর রহমান। উক্ত কিতাবে বিভিন্ন ধর্মের সাথে ইসলাম ধর্মের তুলনামূলক বিস্তারিত আলোচনা করেন, মৌ. মোজাফফর আহমদ সাহেব। পরিশেষে আব্দুল গফুর (সাবেক প্রেসিডেন্ট) সাহেব-এর আলোচনা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

মোহাম্মদ আবুল হায়াত বিশ্বাস

তরবিয়তী সভা

গত ১১/১২/২০০৯ তারিখ রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, উথলী মসজিদ প্রাঙ্গনে জনাব মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ্ সাহেব নায়েব ন্যাশনাল আমীর বাংলাদেশ এর সভাপতিত্বে বাদ জুমুআ উথলী জামা'তসহ সকল অংগসংগঠনের উপস্থিতিতে এক বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে কুরআন থেকে তেলাওয়াত করা হয়। কেন্দ্র থেকে আগত ইন্টারনাল অডিটর সাহেব জনাব ফযলে ইলাহী তিনি বিশেষ নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন, এরপর সেক্রেটারী তবলীগ জনাব তাসাদ্দক হোসেন, তবলীগ ও তরবীয়ত বিষয়ে জোড়ালো বক্তৃতা প্রদান করেন। জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান সাহেব জামা'তের কাঠামো ও বাজেট ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। পরিশেষে সভাপতি সাহেব এর বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে সাধারণ সভা সমাপ্তি ঘটে।

মুয়াযযেম আহমদ সানী

তবলিগী সভা

গত ১১/১২/২০০৯ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত উথলীর মসজিদে এক বিশেষ আঞ্চলিক তবলিগী সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ৩-৩০ মিনিট হতে জনাব মোহাম্মদ ফয়েজুল্লাহ্ সাহেব নায়েব ন্যাশনাল আমীর, বাংলাদেশ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। উক্ত তবলিগী সেমিনারে উথলী, শৈলমারী, বটিয়াপাড়া, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, সরফরাজপুর, বৃহত্তর যশোর-কুষ্টিয়ার জেরে তবলীগ মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

তালিম তরবিয়তী সভা

গত ২১/১১/২০০৯ইং তারিখে মোল্লাপাড়া হালকায় শাহজাহান মোল্লা সাহেবের বাসায় সাপ্তাহিক তালিম-তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ৭০ জন আহমদী এবং ৬ জন মেহমান উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত, নযম বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর পুস্তক পাঠ, দোয়া ও আপ্যায়নের মাধ্যমে সমাপ্তি করা হয়।

মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

শোক সংবাদ

চট্টগ্রামের বিশিষ্ট বুযূর্গ প্রবীন আহমদী কমরুল ইসলাম ভূঁইয়ার ইন্তেকাল

চট্টগ্রাম জামা'তের চক বাজার হালকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বিশিষ্ট বুযূর্গ আহমদী মোহরতম মোহাম্মদ কমরুল ইসলাম ভুঁইয়া (কমরু) ৭৯ বৎসর বয়সে পবিত্র ঈদুল আযহার দিবাগত রাত (২৮ নভেম্বর '০৯ ইং) ১ টায় আকস্মিক হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মরহুম ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলাস্থ বাসুদেব নিবাসী প্রখ্যাত পন্ডিত বহু ভাষাবিদ মরহুম মৌলভী হায়দার আলী ভুঁইয়ার দৌহিত্র।

প্রতিদিন তাহাজ্জুদসহ সময় মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামায, সুফি প্রকৃতির সদাসিধে সহজ-সরল, অতিথি পরায়ন, জামা'তের নিবেদিত প্রাণ, ধার্মিক এই মানুষটির তবলীগে অনেক লোক আহমদীয়াতে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন।

মরহুম মৃত্যুকালে ৩ পুত্র, ৪ কন্যা নাতি নাতনিসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

জামা'তের একনিষ্ঠ খাদেম মহৎ এই মানুষটিকে মহান আল্লাহ্ তাআলা বেহেশ্‌তের উচ্চতর মোকাম জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন এবং তার শোক সন্তপ্ত পরিবারকে আল্লাহ্ তাআলা সাবরে জামিল দান করুন। মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাতের জন্য আহমদী ভ্রাতা-ভগ্নি ও সকল শুভানুধ্যায়ীদের নিকট খাসভাবে দোয়া প্রার্থী।

আফজালুর রহমান রিপন